দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

সময়ের আহ্বানে
ধর্মযোদ্ধা
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য
— পৃঃ ৩১

৭১ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা।। ১৮ মার্চ ২০১৯।। ৩ চৈত্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

খোল দ্বার খোল
লাগল যে দোল

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ৩ চৈত্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৮ মার্চ - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কাশ্মীরিদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা স্বার্থান্বেষী মহলের ▯ ৬

খোলা চিঠি : মামলা চিনে তবেই ভোট ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ শেষ করার এটাই সেরা সময় ▯ ড. সতীশ কুমার ▯ ৮

কোন সর্বনাশের পথে চলেছে পাকিস্তান ▯ সুজাত রায় ▯ ১১

দেশবিরোধীরা পাকিস্তানের হাত শক্ত করছে ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৩

পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধ ও চীনের ন্যক্কারজনক ভূমিকা ▯ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ▯ ১৫

পুলওয়ামার প্রত্যাঘাত জরুরি ছিল ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ১৬

সাহিত্যসেবী সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ২১

গল্প : মোর ঘুমঘোরে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৩

গল্প : উহাদের কথা ও কাহিনি ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ ২৬

সময়ের আহ্বানে ধর্মযোদ্ধা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ▯ প্রীতীশ তালুকদার ▯ ৩১

সমাজ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ▯ শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী ▯ ৩৩

গল্প : বব্বা ও ধনেশপাখি ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ৩৫

গল্প : চতুর্থ তরাইনের যুদ্ধ ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৩৭

জন্মশতবর্ষের আলোকে দত্তোপন্ত ঠেংড়ী ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ১৭ ▯ সুস্বাস্থ্য : ১৮ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ নবাঙ্কুর : ৪৪-৪৫ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ রঙ্গম : ৪৯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৫ মার্চ
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৫ মার্চ
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নির্বাচনী মহারণ ২০১৯

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে। সারা দেশে মোট সাতটি পর্যায়ে ভোটগ্রহণ হবে। এই ঘোষণার অব্যবহিত পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করার রাজনীতি। রমজান মাসে নির্বাচন হলে তাদের অসুবিধা হবে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা তাঁর ক্ষোভকে গুরুত্ব দেননি। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, রমজান হলেও তাদের কোনও অসুবিধা নেই। তাহলে মমতা ব্যানার্জি এরকম করলেন কেন? এয়ারস্ট্রাইক-পরবর্তী ভারতে বিরোধীদের কাছে সংখ্যালঘু ভোট ভাঙিয়ে মুখ রক্ষা করা ছাড়া কি কোনও উপায় নেই? স্বস্তিকায় আগামী সংখ্যায় থাকবে এইরকমই কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সনাতন রায়, চন্দ্রভানু ঘোষাল প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

বসন্তে জীবনের গান

'আমার বসন্ত এসো'—ঠিক এই ভাষাতেই কবি আবাহন করিয়াছিলেন বসন্তকে। বৎসরের ছয়টি ঋতুর মধ্যে এই বসন্তই হইল রং, রূপ এবং রসের ঋতু। পৃথিবীর সব দেশেই বসন্তকে আবাহন জানানো হয় প্রকৃতির আরাধনার ভিতর দিয়া। এই ঋতুতে পৃথিবী নূতন পত্রে-পুষ্পে সজ্জিত হয়। জীর্ণ-পুরাতনকে বিদায় জানাইয়া নূতন প্রাণকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লয় সে। বসন্তেই নূতনের এবং চিরনবীনের আগমন ধ্বনি ধ্বনিত হয়। প্রকৃতিতে, প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টিতে, জীবে এবং জড়ে সর্বত্রই রং লাগে তখন। কবি বলিয়াছেন—'রং যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে...'। প্রকৃতি যখন রঙিন হইয়া উঠে, পত্রেপুষ্পে সজ্জিত হইয়া উঠে সে, তখন, সেই বসন্তেরই শ্রেষ্ঠ উৎসব দোল। ভারতীয় সংস্কৃতির আবহমান ধারারই একটি অঙ্গ এই দোল উৎসব। বৈচিত্র্যে ভরা এই ভারতবর্ষে এই দোল উৎসব সকল ভারতীয়কে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। এই দোল উৎসব ধন্য হইয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে। বস্তুত ভারতের এই সুপ্রাচীন উৎসবটি যে সর্বজনীন এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এই উৎসবটিকে কেন্দ্র করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা। এই উৎসবের ভিতর দিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বাণীটি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইল সৌভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার বাণী। এই বাণীটিই শাশ্বত ভারতের বাণী। এই বাণীটিই চিরকাল ধ্বনিত হইতেছে ভারতাত্মার হৃদয়ে।

দোল উৎসবের সঙ্গে এই বঙ্গপ্রদেশের এক মহাপুরুষের স্মৃতিও জড়িত। তিনি হইলেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই পুণ্য লগ্নটিতেই ধরাধামে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। বলা হয়, কালের প্রয়োজনে এক এক সময়ে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন এই ধরাধামে। কালের প্রয়োজনেই ভগবান বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, আসিয়াছিলেন জগদ্‌গুরু শংকরাচার্যও। শ্রীচৈতন্যের জীবন এবং কর্ম পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, বাংলার এক গভীর সংকটকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য। বহিরাগত মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে একদিকে যখন বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজ বিপন্নপ্রায়, অপরদিকে জাতপাতজনিত নানাবিধ ছুঁতমার্গের কারণে হিন্দু সমাজে যখন অনৈক্য প্রকট—ঠিক তখনই হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করিয়া প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দীপশিখা স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। কৃষ্ণনামকে অস্ত্র করিয়া তিনি মুসলমান শাসককে নতজানু হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনামের মধ্য দিয়াই তিনি জাতপাত এবং ছুঁতমার্গের ঊর্ধ্বে উঠিয়া এক বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সন্ধান দিয়াছিলেন। বাংলা, ওড়িশা হইয়া দক্ষিণ ভারত অবধি তাঁহার প্রেমের বাণীতে প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার পুরুষোদীপ্ত আচরণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার জীবন ও কর্মের ভিতর দিয়া শ্রীচৈতন্য এই শিক্ষাই ভারতবাসীকে দিয়া গিয়াছেন যে, তৃণাদপী সুনীচেন হইয়াও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রকঠোর হওয়া যায়।

বসন্তের উৎসব দোল আমাদের কাছে নূতনের বার্তা বহিয়া আনে। তারুণ্যের বার্তা বহিয়া আনে। আমাদের মনে করাইয়া দেয়, পুরাতন ব্যর্থতা ভুলিয়া, নূতন আশায়, নূতন উদ্যমে বুক বাঁধিতে হইবে। বসন্ত আমাদের কাছে জীবনের বার্তা বহিয়া আনে। আমাদের সমস্ত গ্লানি সে দখিনা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়।

সুভাষিতম্

বলবানপ্যশক্তোঽসৌ ধনবানপি নির্ধনঃ।
শ্রুতবানপি মূর্খোঽসৌ যো ধর্মবিমুখো জনঃ।।

কর্তব্যকর্ম থেকে বিমুখ ব্যক্তি বলবান হয়েও শক্তিহীন, ধনবান হয়েও নির্ধন এবং জ্ঞানী হয়েও মূর্খস্বরূপ হয়।

সন্ত্রাস থেকে কাশ্মীরকে বিরত করতে পরিকল্পনা কেন্দ্রের

কাশ্মীরিদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা স্বার্থান্বেষী মহলের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই প্রচারের নামে শুরু হয়েছে বেলাগাম মিথ্যাচার। অবশ্য ভোটের দিন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই পুলওয়ামা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীরিরা আক্রান্ত গুজবের ছক নিয়েছিল দেউলিয়া রাজনৈতিক দল আর তাদের পদলেহী সংবাদমাধ্যমের একাংশ। অথচ কাশ্মীরি যুবকদের জঙ্গি কার্যকলাপ থেকে বিরত করতে কেন্দ্র দায়বদ্ধ ভূমিকা পালন করছে। একদিকে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান, অন্যদিকে চূড়ান্ত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনওরকম আপোশ করা হবে না, পাশাপাশি নিরীহ সাধারণ কাশ্মীরিদেরও যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকেও সতর্ক নজর রাখা হবে। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক জনসভা থেকে এই বার্তা দিয়েছেন। তারপরেও দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে সামনে রেখে দেশে কাশ্মীরিরা বিপন্ন এই প্রচারের সর্বনাশা খেলায় মেতেছে সংবাদমাধ্যমের একাংশ। আনন্দবাজার তো আরও এককাঠি এগিয়ে বাঙ্গালির কাশ্মীরি নেতা-নেত্রীরা তাদের কায়েমি স্বার্থের জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে কখনোই সহযোগিতার রাস্তায় হাঁটেনি। এমনকী বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়ত কনফারেন্সের নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি ভারতের খেয়ে পরে ভারতেরই বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সন্ত্রাসে বরাবর মদত দিয়েছেন।

এই ধরনের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে কেন্দ্র আঘাত করতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে কাশ্মীরি বিরোধী তকমায় মুড়ে ফেলতে চাইছে স্বার্থান্বেষী মহল, এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য প্রশাসনিক কাউন্সিলের বৈঠকে রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক।

পুনর্বাসন-সহ বিভিন্ন সংস্কার প্রকল্প, বেকারদের আপাতত মাসিক ছ' হাজার টাকা ভাতা— এমনই নানাবিধ পরিকল্পনা করেছে রাজ্য প্রশাসনিক কাউন্সিল। প্রসঙ্গত, নির্বাচিত সরকার ভেঙে যাওয়ায় কাশ্মীরের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব এই কাউন্সিলের ওপরই রয়েছে। রাষ্ট্রপতি শাসনের অন্তর্গত কাউন্সিলের নেতৃত্বে রয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। এছাড়াও মুখ্যসচিব বিভিআর সুব্রহ্মমনিয়ম ও রাজ্যপালের পরামর্শদাতা আরও চারজন।

এই চার পরামর্শদাতার অন্যতম কে বিজয় কুমারকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর কাশ্মীরি যুবকদের বিষয়ে পরিকল্পনাটি আপাতত রাজ্য গৃহ-দপ্তর ও মুখ্যসচিবের টেবিলে রয়েছে। রাজ্যপালের অনুমোদনের পর তা কাশ্মীরি-প্রীতির নানা নিদর্শন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এদেরই ভাবী সম্পাদিকা কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদীদের ধুয়ো তুলছেন।

সম্প্রতি একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে দেখা গিয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত-ই-ইসলামির সঙ্গে পাক-গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। জামাতকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিল মেহবুবা মুফতি-সহ সংবাদমাধ্যমের একাংশ। বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বরাবরই কাশ্মীরিদের মূল স্রোতে ফেরাবার বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে। যে কারণে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির সঙ্গে জোট করে সরকারও গড়েছিল। কিন্তু মেহবুবা, গুলাম নবি আজাদের মতো ভোটের মুখে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে আনন্দবাজারের মতো পত্রিকাগুলির এই প্রবণতা আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা। এই ধরনের মিথ্যাচারকে কীভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের মোড়কে পরিবেশন করা যেতে পারে আনন্দবাজার তার সেরা নমুনাটি দেখিয়েছে। মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, রাজাবাজারের পাকিস্তানি ভোট ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে মমতা ব্যানার্জি যখন জঙ্গিদের 'মানুষ' আখ্যা দিয়ে বালাকোটে কতজন 'মানুষ' মারা গেছেন, তার কৈফিয়ত চেয়েছেন। পরের দিন আনন্দবাজার মুখ্যমন্ত্রীর এই অপরিণামদর্শী বয়ানকে তার স্বভাবসুলভ কুবুদ্ধি দিয়ে ঢেকে দিল, মুখ্যমন্ত্রীর মুখে 'শত্রুপক্ষের মানুষ' শব্দটি বসিয়ে।

মামলা চিনে তবেই ভোট

প্রিয় পাঠক পাঠিকা,

এবার ভোটে নতুন নিয়ম। দু' বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা পাঁচ বছর ভোটে দাঁড়াতে পারবেন না— এ সংক্রান্ত আইন আগেই তৈরি হয়েছিল। এবার কোনও প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকলে সেক্ষেত্রেও কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এখন আর শুধু কমিশনে জানানো নয়, সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট দলকে। তাও নমো নমো করে নয়, অন্তত তিন বার বিজ্ঞাপন দিতে হবে। এবং তা বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলে। এবার লোকসভা ভোটে এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। এর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টের সবিস্তার তথ্যও দিতে হবে কমিশনকে। এবারই প্রথম লোকসভা ভোটে কার্যকর হচ্ছে এই নয়া নিয়ম।

কমিশনের নতুন নির্দেশিকায় কী বলা হয়েছে? মনোনয়ন জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণের আগে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রার্থীদের ফৌজদারি মামলার সবিস্তার তথ্য অন্তত তিন বার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বাধ্যতামূলক। আবার একই দিনে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলবে না। দিতে হবে তিনটি আলাদা আলাদা তারিখে। তবে প্রার্থী নয়, বিজ্ঞাপন দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দলকে।

জানেন কি ক্রিমিনাল কেস নিয়েই সাত সাংসদ রাজ্যে ভোট জিতেছেন? ভোটাররা জানতই না। আর থাকবে না গোপন।

এই রাজ্যে গত লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সাতজনের ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এত দিন ভোটাররা কেউ জানতেই পারেনি। এবার আর তা গোপন থাকবে না। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এবার সেটাও প্রচার করতে হবে। জানতে পারবে ভোটাররা।

গত লোকসভা নির্বাচনের সময়ে কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা দেখে জানা গিয়েছিল দেশের ৫৪৩টি কেন্দ্রে জয়ীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশেরই ফৌজদারি মামলা রয়েছে। 'দ্য ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ' নামের সংস্থা এক সমীক্ষা রিপোর্টে জানায়— ৫৪৩ জন লোকসভা সাংসদের মধ্যে ১৮৬ জন অর্থাৎ ৩৪ শতাংশের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

সেই তালিকায় ছিলেন এই রাজ্যের সাতজন। এদের মধ্যে সবার উপরে ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীরঞ্জন চৌধুরী। হলফনামা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ১৬টি। বাকি সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ।

শ্রীরামপুরের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় পর্যন্ত ফৌজদারি মামলা ছিল একটি। একই ভাবে, কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী, কলকাতা উত্তরের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খানের নামেও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত একটি করে ফৌজদারি মামলা ছিল।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী গত লোকসভা নির্বাচনে তমলুক আসন থেকে সাংসদ হন। তাঁর বিরুদ্ধে সেই সময়ে ছিল দু'টি ফৌজদারি মামলা। দ্বিগুণ এগিয়ে কৃষ্ণনগরের অভিনেতা সাংসদ তাপস পালের ছিল চারটি ফৌজদারি মামলা।

ফৌজদারি মামলা নিয়ে যাঁরা সাংসদ হয়েছেন, সেই ১৮৬ জনের তালিকায় তিন নম্বরে ছিলেন বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তবে তাঁর নামে থাকা ১৬টি মামলার থেকেও অনেক এগিয়ে প্রথম হন বিহারের মাধেপুরের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব। ফৌজদারি মামলা ২৪টি।

—সুন্দর মৌলিক

কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদ শেষ করার এটাই সেরা সময়

ড. সতীশ কুমার

ভারতের ওপর উপুর্যপরি পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অভ্যন্তরে মানুষের ক্ষোভ এখন উচ্চগ্রামে, আবেগ সীমা তুঙ্গে। কাশ্মীরে সম্প্রতি জইশ-ই-মহম্মদ সমর্থিত আত্মঘাতী হামলায় ৪০ জন সি আর পি এফ জওয়ানের মৃত্যুতে উভয়দেশের মধ্যে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। এই জঙ্গিবাহিনী পাকিস্তান থেকে এদের অভিযানের পরিকল্পনা করে। পাকিস্তানে মাসুদ আজহার এদের মাথা, একথা সুবিদিত। পাকিস্তান কোনোদিনই জইশ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পাকিস্তানে নব গঠিত সরকার বিশ্ববাসীকে এমনটা দেখাতে তৎপর যে তারা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়।

পাকিস্তানের মিথ্যে ভাষণের পর মিথ্যে ভাষণের পাহাড় জমে উঠেছে। অন্যদিকে ভারতে আসমুদ্র হিমাচল দেশের সেনাবাহিনীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ চাক্ষুষ করেছে অনেক কিছুই। তবে সবেরই একটা সীমা আছে। সেই ১৯৯২ সাল থেকে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেই চলেছে। ২০০১, ২০০৮, ২০১৬ আর এই ২০১৯-এর সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর হামলা।

আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গনের প্রান্তসীমায়। পাকিস্তান কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে সীমারেখা সফলভাবে মুছে ফেলছে। আজকের কাশ্মীর উপত্যকা এক আশ্চর্য স্থান। সবচেয়ে উপদ্রুত অঞ্চলটিতে যেন সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সহোদর ভাই হিসেবে বাস করছে। সাম্প্রতিক পুলওয়ামার আক্রমণ এই সত্যই আশঙ্কাজনকভাবে মনে করাচ্ছে। এই পরিণতিতে ভারতের সামনে অবলম্বন করার মতো পথ জটিল।

আচ্ছা, সঠিক পথ সন্ধানের আগে আমরা বরং কাশ্মীর ইস্যুতে আমাদের শত্রু কারা তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করি। নিশ্চিতভাবেই বলতে হবে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক শত্রু পাকিস্তান। পাকিস্তানের বর্তমান নির্বাচিত সরকার ছদ্মবেশে সামরিক শাসনেরই প্রকারান্তর। ধরেই নেওয়া যায় পাকিস্তানে অবস্থানকারী সন্ত্রাসবাদীরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের অপসারণের পর পাকিস্তানের বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে কাজ করতে সুবিধে হচ্ছে। মার্কিন সেনা হটে যাওয়ার পর কাবুলে ভারতের প্রভাব ও উপস্থিতির ওপর চাপ বাড়ছে। ইদানীংকালে কাবুল সরকারের মধ্যস্থতায় আফগানিস্তানে ভারত প্রচুর পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ করছিল। এই মুহূর্তে তালিবানরা সেখানে চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। আর তাদের পরিচালন দণ্ডটিও থামবে পাকিস্তানের হাতে। তথাকথিত ভালো তালিবান ও মন্দ তালিবান এক সঙ্গে মিশে যাবে আর তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠবে ভারত। এরই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় কাশ্মীর উপত্যকায় আতঙ্কবাদী হামলার পুনরাবৃত্তির ঘটনায় বাড় বাড়ন্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

জ্বরের তাপ বাড়লে ওষুধের ডোজও বাড়ানো হয়। ভারতের বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার এ চিকিৎসায় দক্ষ। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল ও ঘরে বাইরে বিস্তৃত। চিন্তা ভাবনা না করে দুমদাম কিছু করে ফেললে হঠকারী কিছু ঘটে যেতে পারে।

দ্বিতীয় শত্রু হলো চীন। চীন তার নিজের স্বার্থ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাগুলি নিয়ে এগিয়ে চলবে। ক্রম বিকাশশীল ও শক্তিশালী ভারতকে চীন এক সম্ভাব্য বিপদের উৎস বলেই গণ্য করে। গত বছর quad formation-এর প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে ভারত চীনের কাছে সংকেত পাঠিয়েছে যে ভবিষ্যতে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের আধিপত্যকে ভারত চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছে। চতুর চীন ভারতকে এদিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে অন্য অঞ্চলে ব্যস্ত রাখতে চায়। এই কৌশল পরিষ্কার হয় যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও হাফিজ সইদকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ঘোষণায় চীন বাধা দিতে থাকে। এর ফলে ধূর্ত চীনের সুবিধে হয়ে যায়।

তৃতীয় শত্রু ঘরের শত্রু। কাশ্মীরের হুরিয়ত নেতাবাহিনী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল। এঁরা সদাই এমনভাবে দেশকে সচকিত করে রাখতে চায় যেন বা কাশ্মীর কেউ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছে করে কাশ্মীর সমস্যার আন্তর্জাতিককরণের প্রয়াস চলছে। এই সূত্রে সময়ে সময়ে ধরা পড়া সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে আশিক বাবা নামের এক সন্ত্রাসী জম্মু-কাশ্মীরের সেনা ছাউনিতে এক সময় আক্রমণ চালিয়েছিল। ভিসা পেতে পরিচয় পত্র দিয়েছিল হুরিয়ত নেতারা। জাতীয় তদন্ত সংস্থার বয়ানে এ তথ্য উঠে এসেছে। জইশের কমান্ডাররাই তাকে নাগরোটা সেনা ছাউনি আক্রমণের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এই জঙ্গিরা সর্বদাই হোয়াটসআপ ও টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে পাক অধিকৃত মুজাফফরাবাদের জঙ্গি মৌলানা মুফতি আসগরের সঙ্গে যোগাযোগ

রক্ষা করে চলত। এরই বিশ্বস্ত ভাগনা ওয়াকস দক্ষিণ কাশ্মীরে জইশ-এর কম্যান্ডার ছিল যে পুলওয়ামা পরবর্তী এনকাউন্টারে মারা যায়। আসগর ছাড়াও সন্ত্রাসবাদীরা রাওয়ালপিণ্ডির কারি জরার ও ওয়াসিমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, যারা উপত্যকা ও জম্মুতে নিয়মিত সন্ত্রাসবাদী ঢোকানোর কাজে লিপ্ত। কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা রুটিন করে কাশ্মীরের শান্তি বিঘ্নিত করে থাকে। তারা নিজেদের স্বার্থের রাজনীতিকে প্রথম গুরুত্ব দেয়, তারপর কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেয়। তারা পাথরবাজদের পক্ষ অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না। আর যেটা করে তাহলো সদাসর্বদা সমস্ত দোষ সেনাবাহিনীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার হীন কাজ। কাশ্মীরের সমস্যাটিকে তারা কখনই সামগ্রিক ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে দেয় না ফলে সুবিধে করে দেয় চক্রী পাকিস্তানের নাক গলানোর।

সর্বশেষ কিন্তু মোটেই ফেলনা নয়, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। কংগ্রেসের মদতে সর্বদা মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্ন তুলে তারা কী সেনাবাহিনী কী আধা সামরিকবাহিনীর উভয়কেই ভিলেন বানিয়ে ছাড়ে।

বিকল্প পন্থা

শত্রুদের চিহ্নিত করার পর প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। শুরুর পদক্ষেপে ভারত পাকিস্তানকে এ যাবৎ প্রথম পছন্দের দেশের তকমা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সে দেশ থেক ভারতে ঢোকা পণ্যের ওপর শুল্ক ২০০ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়েছে। পাকিস্তানের ভারতস্থিত হাই কমিশনারকে ডেকে সতর্ক পত্র দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কূটনৈতিক পন্থা শীঘ্রই নির্ধারণ করা হবে। সম্ভবত ভারত হয়তো দু'দেশের মধ্যে বলবৎ থাকা সিন্ধুনদ সংক্রান্ত জলচুক্তি বাতিল করতে পারে। এর পরিণতিতে পাকিস্তানের ভয়াবহ জলসঙ্কটের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। উপসাগরীয় দেশগুলিকে এই সূত্রে পাকিস্তান-বিমুখ করে তোলার সক্রিয়তায় দেখা মিলেছে। এই ধরনের কূটনৈতিক অবস্থানের ফলে তারা নিশ্চতভাবেই পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। দেনায় জর্জরিত বহুমুখী পাকিস্তানকে আই এম এফ-ও চট করে দায়মুক্ত করবে না। এই কূটনৈতিক চাপ একত্রে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করবে।

তবু বলা দরকার শুধুমাত্র কূটনৈতিক চাপই যথেষ্ট নয়, মানুষ কড়া নিদান প্রত্যাশা করছে। আর সেটা দ্বিতীয় সার্জিকাল স্ট্রাইকের ভাবনা। কিন্তু এরও কয়েকটা অসুবিধে আছে। এর প্রলম্বিত রূপ পুরো দস্তুর যুদ্ধ। ঠিক এই মুহূর্তে সেই সম্ভাবনার বিষয়টা সেনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনায় রেখেছে।

এবার দ্বিতীয় শত্রু চীনের প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন কৌশল অবলম্বন করা জরুরি। চীন-পাকিস্তান পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই টেকসই। এক্ষেত্রে ভারতের চাণক্য নীতি অনুসরণ জরুরি। সেই কারণে আফগানিস্তানের পরিকাঠামো উন্নয়নে আমাদের আর জড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। বরং সেখানে তালিবান বিরোধী গোষ্ঠীকে ভালোরকম মদত দেওয়া দরকার। বিশেষ করে সেই সমস্ত তালিবানিদের যারা একই সঙ্গে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সক্রিয় তালিবানিদের বিরোধিতা করবে। তাজিক ও পাখতুন সম্প্রদায়ের লোকজন এই টার্গেট গ্রুপের মধ্যে পড়বে। অর্থ ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়ে তাদের হাত শক্ত করা জরুরি প্রয়োজন। তারাই গোটা খেলায় গেম চেঞ্জার হওয়ার হিম্মত রাখে। চীনের বিশাল প্রকল্প এই ভূমিপুত্রদের বিরোধিতায় মুখ থুবড়ে পড়তে পারে।

তৃতীয় ঘরের শত্রু হুরিয়ত নেতারা। সরকার ইতিমধ্যেই তাদের অভিজাত জীবনশৈলীর সহায়ক নানান ধরনের সুবিধে গুটিয়ে নিয়েছে। ভারত তাদের মূল্যবান নিরাপত্তা দিত। হায়! তারা পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনে সদা তৎপর। এমন থেকে তাদের সব ধরনের কাজকর্মের ওপর সেনার তীক্ষ্ণ নজর রাখা প্রয়োজন। কোনো ভাবে তাদের সন্দিগ্ধ বলে মনে হলেই তাদের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী চক্রান্তের মামলা দিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। কাশ্মীরের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও একই নিদান।

চতুর্থ বামবাদী শহরবিলাসী বুদ্ধিজীবীর দলের ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতার নীতি গ্রহণ প্রয়োজন। সকলেই জানে জ্বরের তাপ বাড়লে ওষুধের ডোজও বাড়ানো হয়। ভারতের বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার এ চিকিৎসায় দক্ষ। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল ও ঘরে বাইরে বিস্তৃত। চিন্তা ভাবনা না করে দুমদাম কিছু করে ফেললে হঠকারী কিছু ঘটে যেতে পারে। যাই হোক না কেন একথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় যে প্রধানমন্ত্রী মোদী পাকিস্তানকে যোগ্য শিক্ষা না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
Email : swastika 5915@gmail.com
সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

রম্যরচনা

পল্টু ট্রেনে করে যাচ্ছে। চেকার এসে টিকিট চাইলো। পল্টু পকেট থেকে বের করে টিকিট দেখালো। হাফ টিকিট।

চেকার— সে কী মশাই এতো হাফ টিকিট। ফাইন দিতে হবে তো আপনাকে।

পল্টু— কেন ফাইন দেব? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।

চেকার— অন্যায় করেননি মানে? এত বয়স্ক লোক হাফ টিকিটে ট্রেনে যাচ্ছেন।

পল্টু— আমি তো একা যাচ্ছি না। আমার সঙ্গে আরও দুজন যাচ্ছে। সিটের তলায় দেখুন।

চেকার দেখেন সিটের তলায় আরও দুজন গুটিশুটি মেরে বসে আছে। বল্টু আর ঝন্টু।

চেকার— একটা হাফ টিকিটে তিনজন যাচ্ছেন?

পল্টু— অন্যায় কী করলাম স্যার? তলায় দুই আর ওপরে এক থাকলে হাফ হয় কিনা বলুন।

উবাচ

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“ওরা একতরফা আঘাত হেনে যাবে, আমরা চুপচাপ বসে থাকব, তা আর হবে না। অনেক আঘাত, যন্ত্রণা সহ্য করেছে ভারত। এবার ভয়ংকর প্রত্যাঘাতের জন্যও ভারত তৈরি।”

গাজিয়াবাদে সি আই এস এফের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে

ভাইয়াজী যোশী
সরকার্যবাহ, আর এস এস

“বিচার ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তবে আমাদের মনে হয় হিন্দুদের ভাবাবেগকে ক্রমাগত উপেক্ষা করা হচ্ছে। আমরা স্পষ্ট করে দিতে চাই অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কীভাবে মন্দির নির্মাণে সব বাধা দূর হয়, তা নিশ্চিত করা।”

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার পরে সাংবাদিক বৈঠকে

অরুণ জেটলি
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

“বিরোধী জোটে সকলেই একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত। এ আসলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মকেন্দ্রিক নেতাদের জোট। এরা কেবল অস্থায়ী সরকার উপহার দিতে পারে। তাই হয় বিশৃঙ্খলা, নয় মোদী— আসন্ন ভোটে একটিকে বেছে নিতে হবে ভোটারদের।”

আসন্ন লোকসভা ভোটের জন্য নিজের ব্লগে

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

“রাহুল গান্ধীর মনের কথা মুখে এসেছে। এটি মুখ ফস্কে মন্তব্য করা নয়। এর পিছনে ছক আছে। ঠিক যে ভাবে রাহুল গান্ধীর গুরু দিগ্বিজয় সিংহ লাদেনকে ‘ওসামাজী’ বলেছেন, হাফিজ সৈয়দকে ‘সাহেব’ বলেছেন।”

রাহুল গান্ধীর মাসুদ আজাহারকে ‘জী’ সম্বোধন করার পরিপেক্ষিতে

কোন সর্বনাশের পথে চলেছে পাকিস্তান

সুজাত রায়

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর নাতনি করাচী নিবাসী সুলেখিকা ফতিমা ভুট্টো কদিন আগেই প্রকাশ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্টতই পাক-প্রশাসনকে লক্ষ্য করে নিউইয়র্ক টাইমসে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ''আমরা গোটা জীবনটাই যুদ্ধ করে কাটিয়েছি। আমি আর পাকিস্তানি সেনাকর্মীর মৃত্যু দেখতে চাই না। আমি দেখতে চাই না, ভারতীয় সেনাকর্মীরও মৃত্যু। আমি চাই না, এই উপমহাদেশ অনাথাশ্রমে পরিণত হোক।''

ভারতের কাশ্মীর উপত্যকার পুলওয়ামায় পাক-সন্ত্রাসবাদের হানা, ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যু এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাক যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে ওঠায় এই সংবেদনশীল লেখিকার বক্তব্য : পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাস জুড়ে রয়েছে বহু রক্তাক্ত কাহিনি। এই ভয়াবহ হিংস্রতার ফল পাক-নাগরিকদের চেয়ে বেশি কেউ ভোগেনি। পাকিস্তানের একনায়কত্বের ইতিহাস, সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতা এবং অনিশ্চয়তার অর্থ হলো, আমাদের প্রজন্মের পাকিস্তানিদের কোনও যুদ্ধের জন্য কোনো আগ্রহ, ধৈর্য নেই। আমারই মতো আজকের পাকিস্তান নাগরিকরা আর অকারণে টেনশন বাড়াতে চায় না। আমি কখনও দেখিনি, আমার দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করছে। আবার এটাও আমাদের অভিজ্ঞতায় নেই যে দুটো পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র ট্যুইটার অ্যাকাউন্টে যুদ্ধ করেছে।'' সঙ্গস অব ব্লাড অ্যান্ড সোর্ড গ্রন্থের মধ্যবয়সী লেখিকা ফতিমা লিখেছেন, ''আমাদের প্রজন্মের পাকিস্তানিরা বাক্-স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। এখন শান্তির দাবিতে জোরালো দাবি তুলতেও আমরা পিছপাও হব না।''

ফতিমা ভুট্টোর এই কণ্ঠস্বর আজ শুধু তাঁর একার নয়। গোটা পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, খেলোয়াড় সকলের। সত্যিই, পাকিস্তানের নাগরিকরা এখন যুদ্ধক্লান্ত। সন্ত্রাসবাদীদের কালো ছায়ায় মোড়া পাকিস্তানের রক্তাক্ত আবহাওয়ায় তাঁরা সিক্ত। এবার তারা মুক্তি চায়। সুস্থভাবে বাঁচবার, প্রাণ খুলে হাসবার, চোখ মেলে দেখবার সুযোগ চায়। সকলেই চাইছে, পাকিস্তান হয়ে উঠুক বিশ্বের অন্যতম একটি সভ্য দেশ। সকলেই চাইছে, একটি উন্নত দেশের পরিকাঠামো গড়ে তুলে দেশকে ধ্বস্ত অর্থনীতি এবং রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে, যাতে সমস্ত পাকিস্তানি সমবেত কণ্ঠে মাথা উঁচিয়ে বলতে পারে, 'আমরা পাকিস্তানি। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরোধী।'

এমনটাই হওয়ার কথা। কারণ, পাকিস্তান এখন সবদিক দিয়ে ব্যর্থ, রিক্ত একটি দেশ যার মাথা বিকিয়ে আছে দেনায়। সেই দেনার পরিমাণ এতটাই যে পাকিস্তানে প্রতিটি নবজাতক জন্ম নেয় দেড় লক্ষ পাক মুদ্রা রুপির বোঝা মাথায় নিয়ে। এরদেশে ৩০ শতাংশ নাগরিক পৌঁছেছে দারিদ্রের শেষ সীমায়। চীন ঋণ দিতে দিতে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে চীন নির্ভর হতে বাধ্য করে তুলেছে। ফলে পাকিস্তানের গোটা বাণিজ্যক্ষেত্রেই এখন চীনের দখলে এবং চীনের সবচেয়ে সস্তা এবং ডাস্টবিনে ফেলার যোগ্য উৎপাদন সামগ্রীতে ভরে গিয়েছে পাক-বাজারগুলি। ফল হয়েছে মারাত্মক। আর এসবেরই কারণ একটিই— সন্ত্রাসবাদ।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত আজকে নয়। প্রথম থেকেই পাক-শাসকরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সন্ত্রাসবাদ হবে তাদের অন্যতম ধর্ম যার পোশাকি নাম হবে 'যুদ্ধ'। এখন পাকিস্তানের প্রতিটি যুদ্ধের পিছনেই কাজ করে যায় সন্ত্রাসবাদীরা। কারণ সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিতে দিতে পাক-দেশপ্রধানরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে গড়ে ফেলেছেন অজস্র ফ্রাঙ্কেনস্টাইন যারা সব সময় হাত বাড়িয়ে রেখেছে তাদের গলার দিকে। সন্ত্রাসবাদীদের কথা না শুনলেই সাঁড়াশীর মতো চেপে বসবে ওই হাত। এভাবেই বছর বছর সরে যেতে হয়েছে তাদের। গত ৭০ বছরে ভারতবর্ষে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে ১৬ বার সেখানে ভারতের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অনেক কম জনসংখ্যার দেশেও এ পর্যন্ত ২২ বার প্রধানমন্ত্রী বদলেছে। কারণ অধিকাংশ প্রধানমন্ত্রীকে জীবন বলিদান দিতে হয়েছে সন্ত্রাসবাদের যুপকাষ্ঠে।

বাড়বাড়ন্তটা চোখে পড়ল ২০০১ সালে। ১৯৮০-র দশকে পেশোয়ারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গুপ্তচর আর জেহাদিদের গোপন ডেরা। এবং পাক সরকারের মদতেই ধীরে ধীরে গোটা পাকিস্তানে তারা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন নামে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে। উদ্দেশ্য একটাই— গোটা বিশ্বের ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে

> **ইমরান খান কিছুটা হলেও বুঝেছেন। তাই যুদ্ধের দামামা থামিয়ে শান্তির ললিতবাণী শুনিয়ে আটক ভারতীয় উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছেন। ভয় পেয়েছেন, যে দেশের জওয়ান অবলুপ্তপ্রায় মিগ-২১ নিয়ে যদি পাকিস্তানের আধুনিক যুদ্ধবিমান এফ-১৬-কে ঘায়েল করতে পারে, তাহলে ওই সেনাবাহিনীর জোশ কতটা তা দেখে।**

ফঃ ২

দেওয়া, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে সবক শেখানো। সব সংগঠনের নেতৃত্বই কম বেশি এক এবং লক্ষ্যও একই। এরা প্রয়োজনে পাক-সরকার ট্যাঁ-ফুঁ করলে যেমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ঘুম ছুটিয়েছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই, তেমনি অশান্তির মৌচাক বুনেছে ভারতের মাটিতে একের পর এক।

২০০০ সালের ১৯ এপ্রিল কাশ্মীরের বাদামিবাগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ কর্পের হেডকোয়ার্টারের সামনে ঘটল আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণ। ২০০১-এর অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় বোমা ফাটল। ১৩ ডিসেম্বর ২০০১, নয়াদিল্লিতে পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ। একের পর এক। কিন্তু ২০১৪ সালে বিজেপি ভারত সরকারের ক্ষমতায় আসার পর আক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেল। ২০১৬-র ২ জানুয়ারি পাঠানকোটের বায়ুসেনার ঘাঁটিতে হামলা হলো। ফের ১৮ সেপ্টেম্বর উরির সেনা ক্যাম্পে আক্রমণ। ২৯ নভেম্বর নাগ্রোটায় খুন হলেন সাত ভারতীয় জওয়ান। ২০১৭-র ২৬ আগস্ট পুলওয়ামায় পুলিশের ওপর হামলা। ফের ডিসেম্বরে একই জায়গায় সেনা-সংঘর্ষ। সর্বশেষ আক্রমণ এবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯। সেই পুলওয়ামায়। নিহত ৪০ জন সি আর পি এফ জওয়ান। শুধু সন্ত্রাসবাদী হানাই নয়, পাকিস্তানের নয়া প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আমলে সেনাসংঘর্ষও বেড়েছে অনেক। ২০১৮ সালে পাক সেনা ২৯৩৬ বার সেনা সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। এর ফলে ৬১ জন ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২৫০ জন। ২০১৭ সালে চুক্তি লঙ্ঘনের সংখ্যা ছিল ৯৭১। মৃত্যু হয়েছিল ৩১ জনের। ওই বছর ৭ জন বিএসএফ জওয়ানের প্রাণ গিয়েছিল সংঘর্ষে। ২০১৮-য় সেই সংখ্যাটা হয় ১৪।

এইই সঙ্গে ভারতীয় মুসলমান যুবকদের, বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যোগ দেওয়ার মাত্রাও বেড়েছে অনেক। সবটা স্বেচ্ছায় নয়। অনেকটাই নৃশংস সন্ত্রাসীদের চাপে শুধুমাত্র কাশ্মীর উপত্যকায় ২০১৫ সালে ওই সংখ্যাটি ছিল ৬৬। ২০১৮-য় তা হয়েছে ১৮১। অর্থ এবং পেট ভরে খাওয়ার চুক্তিতে টগবগে তরুণগুলিকে ভুল বুঝিয়ে জেহাদি করে তুলছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি।

পাকিস্তানের পাশ থেকে আজ প্রায় গোটা পৃথিবীই সরে এলেও, চীন এখনও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানকে পুরোপুরি ত্যাগ করা তাদের পক্ষে এখনই সম্ভব নয়। কারণ পাকিস্তানকে ঘিরে রয়েছে তার দীর্ঘমেয়াদি ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার চীন পাকিস্তানকে ঋণ দিয়েছে। চীন জানে, পাকিস্তান তা শোধ করতে পারেন না। আর পাকিস্তান যত ঋণ শোধ করতে অপারগ হবে, চীন ততই গলা টিপে ধরবে পাকিস্তানের। পাকিস্তানের বিশাল বাজারকে সে সহজে হাতছাড়া হতে দেবে না। ইতিমধ্যেই নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানে যে বিশাল বিশাল পরিকাঠামোগত প্রকল্প চীন হতে নিয়েছে সেগুলো ছেড়ে বেরিয়ে আসাও সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক কারণে চীন ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশকে হাতছাড়া করতে বাধ্য হয়েছে। এখন ভরসা মূলত পাকিস্তান। কিছুটা নেপাল। জোর চেষ্টা চলছে বার্মাকেও নিজেদের দিকে টানতে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনা অধিপত্য তুঙ্গে তুলতে তাই চীনের দরকার পাকিস্তানকে। কারণ পাকিস্তান হবে চীনের মূল বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা ঘাঁটি।

সবই ঠিক কথা, কিন্তু পাকিস্তানের কী লাভ হচ্ছে। কোন অনিশ্চয়তার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান? এতো সর্বনাশের পথে অগস্ত্যযাত্রার সমান। আজ পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রশাসনে একমাত্র বেনজির ভুট্টো আর নওয়াজ শরিফই কিছুটা হলেও চেষ্টা করেছিলেন সঠিক পথে পা বাড়াতে। মোশারফ হোসেন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন এবং বিদেশে পালিয়ে বেঁচেছেন। এখন ইমরান খানকে দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে সবাই— চীন, পাক সেনা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। কারণ সবাই জানে ইমরান খান ক্রিকেটার। রাজনীতির জগতে তিনি কাঁচামাটি। শিক্ষানবিশী ইমরানকে যেভাবে খুশি ব্যবহার করা যায়। হচ্ছেও তাই। ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামার হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের কড়া পদক্ষেপ সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যে হলেও, পাক সরকার এবং পাক সেনা সেই লক্ষ্যের বাইরে নয়। এমনকী ভারত এই বার্তাও চীনকে দিতে চায়— কোনো অবস্থাতেই ভারত আর মাথা নীচু করবে না। আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, পাক সরকার তথা সেনার অবিমৃশ্যকারী রাজনীতি অথবা সন্ত্রাসবাদীদের রক্তচক্ষু— কোনোটাই ভারত সরকারকে অবদমিত করে রাখতে পারবে না। অতীতে যা হবার হয়ে গেছে। এখন গোটা দেশ, দেশের ১৩৫ কোটি মানুষ জাতীয়তাবোধের নতুন উদ্যমে উদ্দীপ্ত। এখন আর পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগই নেই। বুলেটের জবাব দেবে বুলেট। ব্যালটে যাই হোক না কেন।

জুলফিকার আলি ভুট্টোর আদরের নাতনি সম্ভবত সেই বার্তা পড়তে পেরেছেন। তিনি বুঝেছেন, অতীতের নয়াদিল্লি আর আজকের নয়াদিল্লি এক নয়। তিনি বুঝেছেন, শুধু প্রতি আক্রমণ প্রত্যাঘাতের মধ্যেই ভারত নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না। প্রয়োজনে আচমকা হামলায় ইসলামবাদের শিরদাঁড়াটাই গুঁড়িয়ে দেবে ভারত। হয়তো ইমরান খানও কিছুটা হলেও সেটা বুঝেছেন। তাই যুদ্ধের দামামা থামিয়ে শান্তির ললিতবাণী শুনিয়ে আটক ভারতীয় উইং কম্যান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে নিঃশর্তে মুক্তি দিয়েছেন। ভয় পেয়েছেন, যে দেশের জওয়ান অবলুপ্তপ্রায় মিগ-২১ নিয়ে যদি পাকিস্তানের আধুনিক যুদ্ধবিমান এফ-১৬-কে ঘায়েল করতে পারে, তাহলে ওই সেনাবাহিনীর জোশ কতটা তা দেখে।

পাক-সরকারের উচিত তাই অযথা ভারত-বিদ্বেষ ত্যাগ করে নিজেদের দেশ ও জাতি গঠনের দিকে নজর দেওয়া। পাক সেনা কর্তাদের কড়া বার্তা দেওয়া যে সরকার না চাইলে কোথাও আক্রমণ নয়। আর সন্ত্রাসবাদীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দেশছাড়া করা। কারণ যত নষ্টের গোড়া ওই সংগঠনগুলিই।

কাজটা যে সহজ নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা এড়িয়ে ইমরান খানকে এটা করতেই হবে। তা নইলে প্রতিদিন তিলে তিলে তিলে তিলে খতম হবে পাকিস্তান আর সন্ত্রাসীরা। পাকিস্তানিদের যে আল্লার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছনোর জন্য ভুজুং ভাজুং দিয়ে দোজখের পথের পথচারী বানিয়ে দিচ্ছে, সেই পাকিস্তানিরাই পাক প্রশাসন, পাক সেনা এবং পাক সন্ত্রাসবাদীদের নরকের পথে ঠেলে দেবে অচিরেই। ■

দেশবিরোধীরা পাকিস্তানের হাত শক্ত করছে

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলওয়ামার নৃশংস ঘটনার পর দেশবাসীর বৃহদংশই সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছে, সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়েছে। ভারতের অধিকাংশ মানুষ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন। তাঁরা জানেন এবং এতদিনে ভালোভাবে বুঝে গেছেন যে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার দিন শেষ। অতীতে বহুবার আলোচনায় বসা হয়েছে, তা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের উপর হামলা চালিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থই বলেছেন যে 'টেরর' এবং 'টক' একসঙ্গে চলতে পারে না। বাংলায় একটা কথা আছে— 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি', কথাটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রযোজ্য।

পুলওয়ামার ঘটনার পর সারাদেশ শোকাহত। চল্লিশজন জওয়ান দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন। দেশের প্রায় সকল মানুষ প্রতিবাদের জন্য একজোট হয়েছেন। গত সত্তর বছরে বহু ভারতীয় জওয়ান পাকিস্তানের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু এবার ভারতীয় জনমানসে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, এমনটা আগে দেখা যায়নি। ভারত সরকার উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করার পরেই পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের হদিশ পেয়েছে। তার উপর ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানে লালিত-পালিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জয়েশ-ই-মহম্মদ ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারপরেও ওই দেশের মিলিটারির কোলে আশ্রিত ইমরান খান প্রমাণ চেয়ে যাচ্ছেন।

ভারত সিন্ধুনদের বাড়তি জল মানবিকতার খাতিরে পাকিস্তানকে দিয়ে যাচ্ছিল এতদিন ধরে। এবার মোদী সরকার সেটা বন্ধ করেছে। এটা বহুদিন আগেই করা উচিত ছিল। পাকিস্তান থেকে ভারতে আমদানি করা হচ্ছিল সিমেন্ট, সৈন্ধব লবণ, চিনি, ফল, চামড়ার কিছু সামগ্রী। এবার আমদানি শুল্ক ভারত সরকার ২০০ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত পাকিস্তান এবার হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যাচ্ছে।

ভারতের অভ্যন্তরে যে পাকিস্তান-বান্ধবরা বিরাজ করছে, তারা পুলওয়ামার ঘটনাটাকে নিয়ে রাজনীতির খেলায় মেতেছে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ওই আত্মঘাতী জঙ্গিটিকে বলছে 'Home grown terrorist' অর্থাৎ একটি গৃহপালিত বা ঘরে তৈরি সন্ত্রাসবাদী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে 'তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী' বলতেও দ্বিধা করছে না। অর্থাৎ সে ভারতেরই তৈরি অথবা সে মোটেই সন্ত্রাসবাদী নয়। এই সব নেতা নিজেরাই এক একটি Home-grown বা ঘরে তৈরি এনিমি। এরা বুঝতে পারছে না যে আমজনতা এদের সঙ্গে নেই। এরা এখনও ডায়লগের মাধ্যমে 'আমন কী আশা' নিয়ে বসে আছে। এরা কি বোঝে না যে এদের এই সব বক্তব্য পাকিস্তানকে ভারত বিরোধিতায় আরও বেশি উৎসাহ দিচ্ছে? মিডিয়ার একটি বড়ো অংশও মোদী বিরোধী হতে গিয়ে পাকিস্তানপ্রেমী হয়ে বসেছে। এদের মধ্যে পাকিস্তানের কুখ্যাত জঙ্গি পাণ্ডা হাফিজ সইদের অতি প্রিয় একজন সাংবাদিকও আছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রে এটাও জানা যাচ্ছে যে, পাকিস্তানের আইএসআই বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে ভারতে অবস্থিত কতিপয় দেশবিরোধী সংস্থার কাছে ফান্ড সাপ্লাই করে। বিভিন্ন ছোটো ছোটো দেশে, যেমন মালদ্বীপ, বাংলাদেশে সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি আয়োজিত হয় যেখানে ভারত থেকে স্বার্থান্বেষী প্রতিনিধিরা যায়। এদের মধ্যে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক এবং সিনিয়র রাজনীতিবিদও আছেন। এই বিষয়টা নিয়ে সত্যিকারের তদন্ত হওয়া দরকার।

ভারত তার নিজের ভাগের জল পাকিস্তানকে দেওয়া বন্ধ করেছে বলে কিছু পাকিস্তানপ্রেমী লোক কেঁদে কঁকিয়ে একশা। এরা জানে না যে জওহরলাল নেহরু যে চুক্তি করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে, সেই চুক্তি অনুযায়ী (Indus Water treaty) চব্বিশ ভাগ জল ভারতের পাওয়ার কথা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ভারত পেতে থাকল উনিশ ভাগ জল, ভারতেরই ভাগের বাড়তি জলটা চলে যেতে থাকল পাকিস্তানে। এটা কি দেশবাসীর সঙ্গে প্রতারণা নয়? নেহরুর সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করছেন মোদীজী।

পাকিস্তান এত বছর ধরে ভারতের 'Most Favoured Nation' বলে নানা ধরনের সুবিধা, বিশেষ করে ব্যবসা- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভোগ করে আসছিল। এবার সেই স্পেশাল স্টেটাস ভারত উঠিয়ে নিয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুত্ব একতরফা হতে পারে না, বিশেষ করে সেই প্রতিবেশী যদি সদাসর্বদা শত্রুতা করে চলে।

পাকিস্তানি কোনও গায়ক-গায়িকা,

অভিনেতা-অভিনেত্রী বা অন্য শিল্পীদের ভারত ভিসা দেবে না। আশার কথা, এবার বলিউডও পাকিস্তানকে বয়কট করেছে। তবে অবশ্য এই বয়কট কতদিন স্থায়ী হবে, বলা যাচ্ছে না।

ক্রিকেট জগতে বিসিসিআই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী ক্রিকেট বোর্ড। তারা কিন্তু আরও টাকার লোভে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলায় অরাজি নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ভারতের নামজাদা ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে রাজি। আর কত টাকা চাই তাঁর? টাকাটাই সব? দেশ কিছু নয়? যে দেশ তাঁকে প্রচুর ধনসম্পদ, নাম-যশ এবং 'ভারতরত্ন' খেতাব দিয়েছে, তার প্রতিদানে কি কিছুই দেবার নেই? রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলে, সুনীল গাভাসকার, ধোনী— এরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। এদের প্রত্যেকের পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া উচিত। একমাত্র সৌরভ গাঙ্গুলী এবং তাঁর সতীর্থ হরভজন সিংহ, বীরেন্দ্র সেওয়াগ ব্যতিক্রম। এরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন।

শুনলে অবাক হতে হয়, ভারত থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'ক্যারাভান' সম্প্রতি লিখেছে যে, পুলওয়ামার নিহত সিআরপিএফ জওয়ানরা সকলেই নীচু কাস্টের লোক। তারা লিখছে যে ভারতে উঁচু জাতের লোকরা সৈন্যবাহিনীতে কখনো আসে না। নীচু জাতির, ওবিসি এবং সাধারণ গরিব লোকজনই আর্মিতে যোগ দেয়। পুলওয়ামায় শহিদদের জাত নিয়ে তারা সর্বৈব মিথ্যা লিখছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ধরনের পত্র-পত্রিকাও যা খুশী তাই লিখে পার পেয়ে যাচ্ছে। কতখানি নিম্নস্তরের মানসিকতা হলে এই ধরনের মিথ্যার বেসাতি করতে পারে শহিদ সৈনিকদের মৃতদেহ নিয়ে? শুধু কি তাই? এই খবর পাকিস্তান লুফে নিয়েছে। এই রিপোর্ট বেরোবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান আর্মির প্রেস কনফারেন্স ডাকা হলো এবং বিবৃতি দিয়ে জানাল যেটা ক্যারাভান লিখেছে। ইন্ডিয়ান আর্মির কম্পোজিশন সম্বন্ধে একই কথা তাদের বিবৃতিতে প্রকাশ পেল। এটা কি একেবারেই কাকতালীয়? ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয় কি?

পুলওয়ামায় আক্রমণ করে জওয়ানদের হত্যা ভারত সরকারকে অ্যাকশন নিতে বাধ্য করেছে। গত ৭০ বছর ধরে বিশেষ করে গত তিরিশ বছরে পাকিস্তান এবং তাদের দ্বারা লালিত পালিত টেররিস্টরা ভারতের অনেক প্রাণ হরণ করেছে, বহু পরিবারকে সর্বস্বান্ত করেছে, বহু শিশুকে পিতৃহারা করেছে, বহু নিরীহ মানুষকে বিকলাঙ্গ করেছে। ভারত এবার আর গান্ধীজীর পন্থা অবলম্বন করেনি, নেতাজী সুভাষের পন্থাই গ্রহণ করেছে। এয়ার ফোর্স পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসবাদী ডেরাগুলোর ওপর বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, ১০০০ কেজি বোমা ফেলা হয়েছে। ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের চিফ এয়ার মার্শাল স্বয়ং জানিয়েছেন যে, তাদের যেটা করবার ছিল, সেই কাজে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সফল।

আমাদের দুর্ভাগ্য, পাকিস্তানপ্রেমী কিছু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, মিডিয়ার একাংশ, কিছু পলিটিকাল অ্যানালিস্ট, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ভারতের তরফ থেকে যে বিমানহানা করা হয়েছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং প্রমাণ চাইছেন। তাঁরা বলছেন কজন টেররিস্টকে মারা হয়েছে 'আমরা জানতে চাই'। এয়ারফোর্সের তরফে জানানো হয়েছে মৃতদেহ গোনা তাদের কাজ নয়। এইসব পাকিস্তানপ্রেমীদের প্রশ্নগুলি পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকার প্রথম পাতার হেডলাইন হয়েছে। হবেই তো, পাকিস্তান তো আনন্দে আটখানা। তাদের শত্রু হিন্দুস্থানে তাদের এত মিত্র রয়েছে, কেয়া বাত!

ভারতের পাকিস্তানপ্রেমীরা বলছে যে ভারতের এয়ারফোর্স কতগুলো গাছে বোমা মেরে ফিরে এসেছে। পাকিস্তানের এক মন্ত্রী তাদের আইনসভায় দাঁড়িয়ে পরিষ্কার জানিয়েছে যে, যেসব মাদ্রাসার ভেতরে জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলত, আগ্নেয়াস্ত্র চালানো শেখানো হতো, সেগুলোর আর অস্তিত্বই নেই।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলে পাকিস্তানের আবোটাবাদে লাদেনের গোপন ডেরায় আমেরিকার মিলিটারি হানা চালিয়ে লাদেনকে হত্যা করে। তার মৃতদেহটি সমুদ্রে নিক্ষেপে করা হয়। ওবামা ছিলেন ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট। ওই সময় বিরোধীপক্ষ ছিল রিপাব্লিকান পার্টি। এই পার্টির কেউ কিন্তু লাদেনের মৃতদেহ দেখতে চাননি। আমেরিকার ওই অ্যাকশনে বিপাব্লিকান পার্টির কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেনি, প্রমাণ দেখতে চায়নি। বরং দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছে সরকারকে, মিলিটারিকে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন— 'পাকিস্তানকা ঘরমে ঘুসকে মারেঙ্গে।' সেটাই হবে পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার সব থেকে জোরালো অ্যাকশন। জয়েশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই- তৈবা পাকিস্তানেরই প্যারামিলিটারি শাখা। পাকিস্তানের প্রকৃত শাসনকর্তা হলো সেদেশের মিলিটারি। তাদের পাপেট প্রাইম মিনিস্টার ইমরান খানের কোনও নিজস্ব মতামত বা কর্মক্ষমতা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে তার অনুরাগীর অভাব নেই, তারা ইমরানকে 'শান্তির দূত' বলে মনে করে। এরাই নিউইয়র্ক টাইমস্, ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টগুলিকে ধ্রুবসত্য মনে করে যারা ভারতের এয়ারস্ট্রাইক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। তাদেরই কথাগুলিকে এদেশের দিগ্বিজয় সিংহরা কোট করেন, কপিল সিবালরা ওই পত্রিকাগুলির নাম করে বলছেন যে ওদের 'কথা কি অবিশ্বাস করা যায়?' এমনকী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন— আসল সত্যটা কী? বোমাগুলি কি সত্যিই টারগেটে পড়েছিল, না অন্য কোথাও।

ভারতের অভ্যন্তরে জামাত-এ-ইসলাম নামে একটি সংগঠন আছে যাদের জেহাদি কার্যকলাপ ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। তারা কাশ্মীরে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে। এদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের জন্য এদের দুবার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের উচিত হবে সতর্ক থাকা। দেশের অখণ্ডতা, একতা, জাতীয়তাবোধ যেন কোনো ভাবেই বিনষ্ট না হয়। যে যেভাবে পারি,মানুষকে বোঝাতে হবে, বিশেষ করে নবীন প্রজন্মকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের পাঠ্যপুস্তকে, ইতিহাস গ্রন্থে দেশের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়নি। সূর্যসেন, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাতঙ্গিনী, প্রীতিলতার নাম ওরা শোনেনি, বিবেকানন্দ, লাল-বাল-পাল, ভগৎ সিংহ, নেতাজী সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ এদের কাছে শুধুই কতগুলি নামমাত্র, তার বেশি নয়। ওদের দোষ দেব না, ওদের জানতে দেওয়া হয়নি, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যাদের কাছে জীবন-মৃত্যু ছিল পায়ের ভৃত্য, মুক্তির মন্দির সোপানতলে যারা প্রাণ দিল বলিদান, তারা হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। বিবেকানন্দের স্বপ্নের 'জাতীয় চরিত্র' তৈরি হয়নি। তবে আমরা আশা ছাড়বো না, চেষ্টা চালিয়ে যাবো। মানুষের মনে, তরুণ প্রজন্মের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে, কাজটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। ■

পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধ ও চীনের ন্যক্কারজনক ভূমিকা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ দুটো জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়— সন্ত্রাসবাদের বিপদ আর ভারতের নিরাপত্তার দুর্বলতা, কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে দেখায় চীনের ভূমিকা, বিশেষত উহান চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে। পাকিস্তানের মাটিতে পুষ্ট জয়েশ-ই-মহম্মদ দাবি করেছে যে তারা পুলওয়ামায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তাতেও পাকিস্তান প্রমাণ চাইছে। আর কত প্রমাণ দিতে হবে? ভারত মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে গণ্য করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে বারবার আবেদন জানিয়েছে; সব সদস্য রাষ্ট্র তাতে সমর্থন জানিয়েছে, একমাত্র চীন তাতে ভেটো প্রয়োগ করে ভারতের সেই প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়েছে।

আসলে ভারতের সীমান্ত ভীতি সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা কাজ করেছিল শুরু থেকে, তা হলো ভারতের সীমান্তের বিপদে পাকিস্তান ও চীনকে একত্রে ভাবতে হতো তা হয়নি নেহরু ও কংগ্রেসের ভুলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ভারত দুই তরফে সীমান্তের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল— চীনের তিব্বত দখল ও পাকিস্তানের জম্মু-কাশ্মীরের বৃহৎ অংশ দখল। এর ফলে ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অনাবৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারত সীমান্তের ব্যাপারে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে তখন বিচার করেনি। এই ভ্রান্ত বোঝার ফল হয়েছে মারাত্মক, ভারতের সন্ত্রাস-দমন নীতি কার্যকর হয়নি। এটা কংগ্রেস শাসনের উত্তরাধিকার।

ব্রিটিশরা ভারতকে তিব্বতের ব্যাপারে অনেক কিছু সুবিধা দিত। ১৯৫৪ সালে নেহরু চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে সেই দেশের সঙ্গে একটা চুক্তি করেন। তাতে সেই সমস্ত সুবিধা থেকে ভারতকে বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হয়নি। ভারত-চীন প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৬২ সালে চীন অতর্কিত ভারত আক্রমণ করে আর অপ্রস্তুত ভারত যুদ্ধে হেরে যায় ও ভারতের প্রায় ৩২ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা চীন দখল করে নেয়। এটা নেহরুর আহম্মকি ও বেইজ্জতির ফল। নেহরু সবার সঙ্গে মাস্টারি ফলাতেন, পাণ্ডিত্য জাহির করতেন, কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঠিক ভাবে গড়ে তোলার দিকে নজর দেননি। এমনও শোনা যায় (অবশ্য তার কোনো তথ্যপ্রমাণ বর্তমান লেখকের হাতে নেই) নেহরু বিশ্ব শান্তির পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশায় কাউকে আক্রমণ না করার নীতি নিয়েছিলেন এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি নিয়েছিলেন, অথচ তিনি সেই সোভিয়েত ব্লকের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। এই ব্যর্থতার গ্লানি তাঁকে এতটা গ্রাস করেছিল যে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত কার্যত কিছুই বাধা দেয়নি। আয়ুব খান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "আমরা মাত্র বারোজন লোক নিয়ে ঢুকেছিলাম কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ভারতের তরফে কোনো প্রতিরোধই হয়নি। যখন ভারত আমাদের থামতে বলল আমরা তখন অনেকখানি ঢুকে পড়েছি"। আর সেখানেই আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারিত হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ভারতের কাশ্মীরের প্রায় ৩৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে নিয়েছে যা এখন আজাদ কাশ্মীর নামে পাকিস্তান উল্লেখ করে আর ভারত বলে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)। ১৯৬৩ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত- চুক্তির ফলে পাকিস্তান পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের শাকসগম উপত্যকার ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীনকে উপহার দেয়। এতে বেজিংয়ের পক্ষে কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবিকে বৈধতা প্রদান করে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর থেকে চীন-পাকিস্তান চক্র তৈরি হয়। তখন থেকে চীন সর্বদা ভারতকে পাকিস্তান-তাস দেখায় যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত মাথা তুলতে না পারে। চীন পাকিস্তানকে পারমাণবিক শক্তি অর্জনে সবরকম সহযোগিতা করেছিল যাতে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে সমতা রক্ষা হয়। আসলে চীনকে বাদ দিলে পাকিস্তানের পারমাণবিক ক্ষমতা শূন্য। অধুনা চীন-পাকিস্তান আঁতাত ভারতের সন্ত্রাস-দমন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

চীন কখনোই তার সবসময়ের বন্ধু পাকিস্তানকে ছাড়বে না। ভারতের ক্ষেত্রে যে কোনো সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ উঠবেই, শাকসগম প্রসঙ্গ আসবেই। আর চীন কখনো তার সাধের বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) নীতি পরিহার করবে না।

যতবার ভারত পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠনগুলিকে নিরাপত্তা পরিষদের তালিকাভুক্ত করতে উদ্যত হয়েছে চীন তা রুখে দিয়েছে। ২০১৭ সালে শেষবার চীন ইউএনএসসি-র ১২৬৭ কমিটির দ্বারা মাসুদ আজাহারকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য ভারতের প্রয়াসকে রুখে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, চীন জম্মু-কাশ্মীরের ভারতীয় নাগরিকদের স্টেপলড্ ভিসা প্রদান করে কার্যত ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এবং কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবিকে ন্যায্যতা প্রদান করেছে।

বর্তমানে চীন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডর (সিপিইসি) যেটা পিওকে-র মধ্য দিয়ে গেছে তা শুধু ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করেনি, ভারত মহাসাগরে ভারতের নৌ-শক্তিকেও ক্ষুণ্ণ করেছে এবং বিশ্বের প্রাথমিক তেল-চেক পয়েন্ট হর্মুজ প্রণালীর উপর চীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। পাকিস্তানের গওদর নৌ-ঘাঁটিকে চীনা নৌ-ঘাঁটি করে দেওয়া হলে তা সরাসরি ভারতের পক্ষে সামরিক বিপদ-স্বরূপ হবে।

কিন্তু চীন কখনোই তার সবসময়ের বন্ধু পাকিস্তানকে ছাড়বে না। ভারতের ক্ষেত্রে যে কোনো সন্ত্রাসবাদ বিরোধিতায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ উঠবেই, শাকসগম প্রসঙ্গ আসবেই। আর চীন কখনো তার সাধের বেল্ট অ্যান্ড রোড (বিআরআই) নীতি পরিহার করবে না।

তাই ভারতকে চীনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে। নতুবা উহান সমঝোতায় ভারত-চীনের সম্পর্কের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা অধরাই থেকে যাবে। ■

পুলওয়ামার প্রত্যাঘাত অত্যন্ত জরুরি ছিল

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কাশ্মীরের পুলওয়ামা কাণ্ডে পাকিস্তানে আশ্রিত জইশ-ই-মহম্মদ- এর আত্মঘাতী হামলায় মোট ৪০ জন ভারতীয় সি.আর.পি.এফ জওয়ান শহিদ হন। তার প্রতিবাদে সারাদেশ উত্তাল হয়ে উঠে। জানিয়েছেন খেলার জগৎ থেকে চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমানেরা।

বায়ুসেনার এই সাফল্যে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জওয়ানদের কুর্নিশ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব এবং এবং স্বাধীনতা অর্পণ করেন সেনাবাহিনীর হাতে। তাঁরই ফলস্বরূপ পুলওয়ামা ঘটনার ১২ দিন পর মঙ্গলবার রাত ৩-৩০ মিনিট থেকে ৩.৫১ মিনিট পর্যন্ত ২১ মিনিটের মধ্যে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ১২টি মিরাজ ২০০০ যুদ্ধ বিমান সীমান্ত পেরিয়ে ৮০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে এক হাজার কেজি ওজনের বোমা ফেলে মাসুদ আজাহারের দুই ভাই এবং শ্যালক সহ অসংখ্য জয়েশ জঙ্গিকে খতম করেছে। ধ্বংস করেছে জয়েশের বিশাল জঙ্গিঘাঁটি। পাকিস্তান এ খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। বোমা বর্ষণ হয়েছে বালাকোট, চোকোটি ও মুজফফরাবাদ। এদিনের আঘাতে জয়েশ জঙ্গি ঘাঁটি শেষ, উচ্ছ্বসিত মোদী। উল্লসিত দেশ। বিমানবাহিনীর প্রশংসায় টুইট করে একে একে অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন— শক্ত হাতে সুরক্ষিত দেশ। এই সময় যদি পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে তাহলে ভারত যেন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনরায় উদ্ধার করে নেয়। কেননা পাকিস্তান অন্যায়ভাবে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। উপরন্তু কাশ্মীরের ৩৫-এ এবং ৩৭০ ধারা বাতিল করা অত্যন্ত জরুরি। তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম যেখানে যত দেশদ্রোহী শক্তি, পাকিস্তান প্রেমী এবং তাদের সমর্থক যারা রয়েছে তাদেরও ধরে ধরে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। প্রসঙ্গত সম্রাট আকবরের সময়ের একটা ঘটনা উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সে সময় ফকিররা যত্রতত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের জবাই করছে। বিখ্যাত সাধক ও পণ্ডিত মধুসূদন সম্রাটকে সব কথা খুলে বললেন। সম্রাট বললেন, আমি ফরমান জারি করতে পারব না; কারণ ধর্ম। তবে একটা পথ বাতলে দিচ্ছি। আপনারা সাধুদের বলে দিন— ওরা একটা মারলে আপনারা দশটা মারবেন। তাই হলো। সব ঠাণ্ডা। সুকুমার রায়ের সেই ছড়ার লাইন, 'তেড়ে মেরে ডান্ডা করে দেব ঠাণ্ডা'। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট তাকে সেই ফুল দিয়ে পুজো না করলে সন্তুষ্ট হয় না। এর স্বীকৃতি মেলে ইজরায়েলের মানসিকতায়। আমাদেরও ইজরায়েলের মতো মনোভাব চাই এবং আকবরের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। যেন উগ্রপন্থীরা, হামলাকারীরা আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে কিংবা আমাদের ক্ষতি করার আগে হাজারবার চিন্তা করে। পুলওয়ামার প্রত্যাঘাত অত্যন্ত জরুরি ছিল। তবে পাকিস্তান এখনও পাকিস্তানেই আছে। এই ঘটনার পর পাকিস্তান কয়েক জায়গায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি ইতিমধ্যে লঙ্ঘন করেছে এবং ভারতের তরফ থেকে পাল্টাও পেয়েছে। ইমরান খান হুমকি দিয়েছেন, আমরা বদলা নেব। শোনা যাচ্ছে মাসুদ আজাহার এখন ভয়ে পাকিস্তানের সেনা হাসপাতালে আত্মগোপন করে আছে।

পুলওয়ামায় আমাদের বীর শহিদ সেনানীদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং অধিকৃত কাশ্মীরে তার বদলা নেওয়া বীর সেনানীদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। ■

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

মা— আমার পৃথিবী

রুনা চৌধুরী (রায়)

'হাজার বছর দেখেও যায় না যারে চেনা, লক্ষ্য কোটি দামেও যাঁকে যায় না কেনা, সেই যে আমার মা।' ত্রিভুবনে যার নেই কোনো তুলনা। জন্মাবার পর প্রথম যাকে দেখলাম সেই আমার মা। সেদিন থেকেই মাকে ভালবাসলাম। মাকে ঘিরে আমার এই বিশ্ব। মা আমার ছত্রচ্ছায়া। মা আমার রক্ষাকবচ। আমার নিঃস্ব হৃদয়ের স্নেহের সাগর। মা দেখিয়েছেন আমায় এই বিশ্বজগৎ। মা আমার হাসি-কান্না, ব্যথা- বেদনার স্বপ্নমধুর স্বর্গ। মা ডাকে জুড়ায় মন প্রাণ। মা ডাক অমৃতের মতো মধুর যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মায়ের আদর, স্নেহ, মমতা যে পায়নি সে সত্যি কাঙাল। সে বুঝবে না মায়ের ভেতর কী জাদু লুকিয়ে থাকে। মাকে নিয়ে আমার অনেক গর্ব। আমার মা একজন বহু গুণধারিণী, স্নেহের সাগর, অতুলনীয়া নারী। আমার বাবাও অসাধারণ, অভ্রংলিহ দেবতুল্য, কষ্টসহিষ্ণু, বহুগুণসম্পন্ন এক রূপবান মানুষ। মা, বাবা দুজনেই আমাদের এই বিশ্বকে চিনিয়েছেন। তাঁরা দুহাত ভরে দান করে গেছেন, প্রতিদানের প্রত্যাশা করেননি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা-বাবাকে পেয়েছি এবং কালের নিয়মে হারিয়েও ফেলি— শত শত যোজন ভালোবাসি, মায়ের ঋণ অপরিশোধ্য, মা ছাড়া এ পৃথিবীতে কখনও কিছু ভাবতে পারি না। তাই মায়ের মর্যাদা, মায়ের সম্মান করা প্রত্যেকের কর্তব্য। যে সন্তান মা-বাবার সম্মান করে না সে জীবনে কোনোদিন কিছু অর্জন করতে পারে না— 'No honour can be achieved without blessings of Parents' মায়ের স্থান আমাদের মাথার উপরে হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করে এসেছে যারা তাদের প্রতি বিশ্বের নারীরা আজ এক যোগে জানাতে চায় দয়া করে নারী নিয়ে ব্যবসা, নারীপাচার, নোংরামো কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ হোক। গর্ভধারিণী মায়ের জাতিকে সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর হয়ে বাঁচার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক। আজকাল সংবাদপত্রে, ব্রেকিং নিউজে খবরও শোনা যায় ছেলের হাতে মা খুন, সামান্য পয়সার লোভে, নিজেদের স্বার্থে কোনোরকম আঘাত লাগলে আর দ্বিরুক্তি না করে গলায় কোপ মেরে সেই জন্মদাত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে ওই কালসাপরূপ সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল, যে নেশার জন্য পয়সা দিতে পারেনি, মদ, জুয়ার আড্ডা থেকে সরে আসতে বলেছিল সেই মা-ই চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে পথের কাঁটাকে সরিয়ে ফেলতে দ্বিধা করে না। সম্পত্তির বাদবিবাদেও মাকে সন্তানরা খুন করছে, কেউ তিলেতিলে কষ্ট দিচ্ছে, কেউ বা দূরে কোথাও রেখে দিয়ে আসছে।

হতভাগ্য মা-বাবাদের মর্মান্তিক পরিণতি ওই সন্তানদের কারণেই। জেলখানায় গিয়েও মনে হয় ওদের অনুশোচনা হয় না। মাতৃ জাতিকে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে দেওয়া হোক, নারী নিয়ে নোংরামি নয়, নারী দিবসে এই হোক সভ্য সমাজের অঙ্গীকার। ▮

ছোটোদের স্থূলতা ও প্রতিকারের উপায়

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অনেক বাবা মা ভেবে থাকেন, বাচ্চা যত গোলগাল সে তত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু অধিকাংশ সময় অতিরিক্ত ওজন বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বাচ্চার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রত্যেক বাবা-মা চিন্তা করেন। ওবেসিটি এমন একটা সমস্যা যা অনেক সময় নজর এড়িয়ে যায়। বাচ্চার উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওজন বাড়ে, তবে তা সঠিক অনুপাতে বাড়ছে কিনা সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। না হলে কখনও যে আপনারা বাচ্চা ওবেস হয়ে যাবে আপনি বুঝতেও পারবেন না।

দৈহিক ওজন বৃদ্ধির মূল কারণ হলো শক্তি ও তার ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতি। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি তার প্রাত্যহিক চাহিদার চেয়ে বেশি ক্যালরি প্রতিদিন বা প্রায়ই খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করে, তবে তার বাড়তি অংশ শরীরের মেদ হিসাবে জমতে থাকবে। নিয়মিত বাচ্চার দৈহিক ওজন মাপুন। প্রত্যেক বয়সের জন্য একটা কাঙ্ক্ষিত দৈহিক ওজন আছে। যদি আপনার বাচ্চার ওজন তার নির্দিষ্ট মাপের থেকে ২০ শতাংশের বেশি হয়, তাহলে বুঝবেন বাচ্চার ওবেসিটির সমস্যা রয়েছে।

বেসাল মেটাবলিক পার্সেন্টাইল চার্ট ব্যবহার করেও ওবেসিটি মাপা যায়। আপনার বাচ্চার মেটাবলিক ইনডেক্স যদি ৯৫ পার্সেন্টাইলের ওপরে হয়, তাহলে জানবেন আপনার বাচ্চা ওবিস গ্রুপে পড়ে।

বাচ্চারা আজকাল খুব একটা খেলাধুলা ছোটাছুটির সুযোগ পায় না। বাড়িতে বসে ইন্টারনেট সার্ফ বা ভিডিয়ো গেম খেলা বা টেলিভিশন দেখাটাই তাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। এরকম শারীরিক শ্রমহীন জীবনযাপনের জন্য যথারীতি বাচ্চার ওজন বাড়তে থাকে এবং ক্রমশ ওবেসিটির দিকে এগোয়।

টিভি দেখাটা বাচ্চাদের কাছে প্রায় একটা অ্যাডিকশন। খেলাধুলা ছেড়ে বাচ্চারা বাড়িতে বসে টিভি দেখাটা বেশি পছন্দ করে। আর টিভি দেখতে দেখতে চিপস, চকোলেট , পপকর্নের মতো মুখরোচক খাবার খাওয়া এখন রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এক দিকে ক্যালরি গ্রহণ বৃদ্ধি, অন্যদিকে খেলাধুলার প্রতি অনীহা, সব মিলিয়ে ওজন দ্রুত হারে বাড়তে থাকে।

বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তারা কী খেতে ভালোবাসে, বেশিরভাগ বাচ্চাই উত্তর দেবে, চকোলেট, কোল্ডড্রিংকস, রোল। আর কেক, পেস্ট্রি তো আছেই। এক কথায় জাঙ্ক ফুড। এসব খাবারের মধ্যে ক্যালরির পরিমাণ খুব বেশি থাকে যা স্বাভাবিকভাবেই ওজন বাড়িয়ে দেয়।

বাচ্চারা সাধারণত বাবা-মাকে দেখে অনেক কিছু শেখে। আজকের দিনে বাবা-মায়েরাই যেহেতু ব্যায়াম বা এক্সারসাইজের ব্যাপারে উদাসীন। ফলে দৈহিক স্থূলতা স্বাভাবিক ভাবে এসে যাবে।

বেশিরভাগ পরিবারেই আজকাল বাচ্চার সংখ্যা ১ বা ২ থাকে। ফলে বাবা-মায়েরা একটু বেশি তাদের প্যাম্পার করে থাকেন। বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো হবে এ ভেবে অনেক সময় তারা বেশি করে বাচ্চাকে খাওয়াতে থাকেন। শুধু বাচ্চাকে খুশি করতে তার যা খেতে ইচ্ছা করে সেই খাবার নিমেষে হাজির হয়ে যায়। তা সে যতই হাই ক্যালরিযুক্ত খাবার হোক না কেন। ছোটোবেলায় যদি আপনার বাচ্চা অতিরিক্ত মোটা হয়, বড়ো হয়ে ওজন আরও বাড়তে পারে। ফলে নানারকম অসুখ যেমন হার্ট ডিজিস, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ইত্যাদি হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ওজনের ফলে বাচ্চা সহজেই ক্লান্ত এবং কর্মোদ্যমহীন হয়ে পড়ে। অনেক সময় মোটাসোটা বাচ্চার স্কুলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে না। কখনও কখনও অন্য বাচ্চারাও নানারকমভাবে স্থূলকায় বাচ্চাদের টিজ করে। ফলে ওদের মধ্যে হীনম্মন্যতাবোধ বা মানসিক চাপ দেখা যায়।

কী করে ওবেসিটি আটকাবেন : ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে শুধু মায়ের বুকের দুধ খাওয়ান, এতে মোটা হাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। বাচ্চাকে স্বাস্থ্যকর খাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহিত করুন। সুষম খাদ্যের ওপর নজর দিন। খেয়াল রাখবেন, যেন খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল পরিমাণ মতো থাকে। কোনো কিছুরই আধিক্য যেন না থাকে, তা হলেই বাচ্চা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে। টিভি দেখতে দেখতে বাচ্চার চিপস, সফট ড্রিংক্স খাওয়ার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেবেন না। আউটডোর গেমস খেলতে বাচ্চাকে উৎসাহ দিন।

বাড়িতে জাঙ্কফুড খাওয়ার অভ্যাস কমান। বাচ্চাকে বাড়ির খাবার সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে দিন যাতে বাইরের খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। ছোটোদের স্থূলতা দূর করতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ।

ফোন : ৯৮৩০৫০২৫৪৩

লোকসভার ভোট হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের নিরিখে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নজরুল মঞ্চের কর্মীসভায় তার কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আমার ৪২-এ ৪২ চাই। কি, এটা তোমরা দিতে পারবে?' গণতন্ত্রের দেশে ভোট দেয় তো জনগণ, আর জনগণের ভোটে লোকসভার এমপি নির্বাচিত হয়। শুধমাত্র কোনো পার্টির কর্মীর ভোটে নির্বাচিত হয় না। তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তার দলের কর্মীদের প্রকারান্তরে অসৎ উপায় অবলম্বন করে যেন তেন প্রকারেণ ভোটে জেতার কথা বলছেন। গণতন্ত্রে মানুষ ভোট দেয় লোকসভার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিগত পাঁচ বছরের কাজের নিরিখে। দেশ পরিচালনায় যোগ্য প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনে। সেটাই বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। তাই সাধারণ মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, দেশ রক্ষার্থে মুখ্যমন্ত্রীর প্ররোচনায় তার কর্মীদের দ্বারা যে কোনো অসৎ উপায়কে প্রতিহত করে অবাধ ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন করতে এগিয়ে আসুন।

—সঞ্জয় মুখার্জী,
হাওড়া-২।

দ্বাদশশ্রেণীর সদ্যোজাত সন্তানের মা কন্যাশ্রী!

'ঘণ্টাখানেকে পরীক্ষায় প্রসূতি' এক বাজারি পত্রিকার উত্তরবঙ্গ সংস্করণের এই খবরটিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মোবিনার সন্তান প্রসবের খবর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে। এর আগের আরও একটা খবরে ওই একই পত্রিকায় লেখা হয়েছে, 'পরীক্ষার মাঝেই প্রসবযন্ত্রণা, হার মানলেন না সদ্যপ্রসূতিও' (১ মার্চ)। প্রসূতির বর্ণনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লেখা হয়েছে, 'সোজা হয়ে বসার ক্ষমতা নেই। দু'পা ছড়িয়ে বসে তিনি। কোলের উপর রাখা পরীক্ষার খাতা। পাশে সদ্যোজাত ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন দিদিমা। সন্তানের জন্ম দেওয়ার ১৪ ঘণ্টা বাদে এভাবেই হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিলেন একজন। অন্যজন আবার পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর ভর্তি হলেন হাসপাতালে। যন্ত্রণা উপেক্ষা করে সেখানেই পুরো সময় পরীক্ষা দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার এই দুই সাহসী কন্যার পরীক্ষার সাক্ষী হয়ে রইল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতাল।' লক্ষণীয়, এই দু'জনকে সাহসী কন্যাকে আখ্যা দিয়েছে বাজারি পত্রিকা— 'এই জৈবিক কাজ করার জন্য তারা 'সাহসী' হয়ে গেলেন।' 'সাহসী'র এই সংজ্ঞায় আমরা শিহরিত হচ্ছি। এদের যদি সাহসী বলা হয় তাহলে ইউসুফ মালালা অথবা আমাদের দেশের অভিনন্দনকে কোন বিশেষণে বিভূষিত করা হবে।

সদ্যোজাতকে সামনে রেখে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো বিষয়ের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে দেওয়া সম্ভব কি না সে প্রশ্ন আপাতত উহ্য থাকুক। প্রশ্ন হলো, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হিসেবে মোবিনার বয়সটা কত? ১৮ বছরের বেশি তো নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই এই বয়সী মেয়েদের সন্তান হওয়ার খবর বাজারি পত্রিকার পৃষ্ঠাতে ছাপা হয়ে চলেছে, অথচ রাজ্য সরকার বাল্যবিবাহ রোধ ও উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প সহ নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করে চলেছে। এই প্রকল্পের পেছনে বছরে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দও করা হচ্ছে। কিন্তু এইসব অল্প বয়সিরা যদি পরীক্ষা কক্ষে বা পরীক্ষার সময়ে সন্তানের জন্ম দেয় তাহলে উচ্চশিক্ষার হাল কী হবে? ১০-১২ বছর আগেও ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে কলেজ চত্বরে প্রবেশের কথা ভাবাও যেত না— এসব ঘটনা এখন আকছার। সংবাদপত্রে এগুলিকে গ্লোরিফাই করা হলে জনবিস্ফোরণের হার কোন পর্যায়ে যাবে সেটা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কালিয়াচক ব্লকের বাঙ্গিটোলা, মোথাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলোর পরিচয়ই অন্য রাজ্য বা দেশ কাজ করা শ্রমিকদের পীঠস্থান হিসেবে। পরীক্ষার্থী মোবিনার স্বামী ফিরোজ শেখও

চিঠিপত্র

একজন সেরকম শ্রমিক। এইসব অঞ্চলের অনুন্নয়ন তথা মানব উন্নয়ন সূচক ও জনবিস্ফোরণ হাত ধরাধরি করে চলে। জনবিস্ফোরণে লাগাম না পরালে উন্নয়ন সুদূর পরাহত হতে বাধ্য।

—শুভ্র সান্যাল,
ইংরেজবাজার, মালদহ।

ইসলামিক সন্ত্রাস ও সেকুলারি ভাবনা

জন্নতে পৌঁছানোর পথটা কতটা সহজ, তা দেখিয়ে দিয়েছে ইসলামিক জিহাদিরা। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় আল কায়দার দুই আত্মঘাতী জঙ্গি বিমান ছিনতাই করে এবং সেই বিমানের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। বহু মানুষ হতাহত হলো আমেরিকার নিজ সৃষ্ট 'ফ্র্যাঙ্কেইনস্টাইন দৈত্য'র উন্মাদ উল্লসিত আচরণে। একদা আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকা এই দৈত্য সৃষ্ট করেছিল। আজ এই দৈত্য বিভিন্ন নামে বিভিন্নরূপে সমগ্র বিশ্বে তার বিচরণ জানান দিচ্ছে। এই একবিংশ শতকের প্রথম থেকে ভারতবর্ষের বুকে সন্ত্রাসবাদের এক ভয়ংকর রূপ বিভিন্ন রঙে আছড়ে পড়ছে। ধর্মনিরপেক্ষী কংগ্রেস সরকার গুরুত্ব দিয়ে এর কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করেনি। তাদের প্রতিহত করা তো দূরের কথা, হালকাচালে সেইসব ঘটানা সংবাদমাধ্যমের উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে সত্যকে চেপে যেতে বাধ্য করেছে। ২০১৪-য় নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপির এনডিএ জোট ক্ষমতাসীন হলে পাকিস্তান ভারতকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সন্ত্রাসের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। মুম্বাই, উরি, পাঠানকোট এবং সম্প্রতি কাশ্মীরে পুলওয়ামায় সি আর পি এফের

কনভয়ের উপর আত্মঘাতী হামলা হলো। নরেন্দ্র মোদী সরকার যখনই এর প্রত্যুত্তর দিবার চেষ্টা করতে লাগলো তখনই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামধারী রাজনৈতিক দল এবং ভারতবর্ষের কয়েকটি আঞ্চলিক দলের নেতা-নেত্রীরা, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল গলায় ধর্মনিরপেক্ষতার তবক ঝুলিয়ে নেমে পড়ে তাদের নিজ নিজ রাজনীতির ময়দানে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া প্রতিবেদনে উঠে এল 'তদন্ত না করে পাকিস্তানকে দোষী বলা যাবে না'। আর এক ধাপ এগিয়ে উনি বলে উঠলেন, 'জঙ্গির জাতধর্ম হয় না, গোটা দশ ঐক্যবদ্ধ।' সেটা সবাই জানে এটা কোনো এক নতুন কথা নয়। কিন্তু এই প্রশ্নে যখন জঙ্গিদের মদতদাতা হিসেবে যখন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের নাম উঠে আসছে তখনই 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' —এই বাণী ছড়িয়ে কলকাতার রাস্তার দলের কর্মীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে তাদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। অতীতে সিপিএম এই একই কায়দায় কলকাতার রাস্তায় মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ করেছে। সেই পথেই হাঁটছে আজকের বর্তমান রাজ্য সরকার। সবাই জানে ৮০-র দশকে আফগানিস্থানে রুশ উপস্থিতি কী সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছিল পাকিস্তান। আমেরিকা একদা সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল এবং আমেরিকা পাকিস্তানের কাছে বারবার পরোক্ষভাবে প্রতারিত হয়েছিল সন্ত্রাস দমনের অর্থ উপঢৌকন দিয়েও। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প পূর্ববর্তী আমেরিকার রাষ্ট্র প্রধানরা এর থেকে কোনও শিক্ষাই নেননি? যদি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ওই পদে আসীন না হতেন, তাহলে পাকিস্তানের অতীত ও বর্তমান শাসককুলের মুখোশের অন্তরালে কত গোপন ফন্দি এঁটে রেখেছে পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রিয় রাষ্ট্রগুলির অজানাই থেকে যেত। সন্ত্রাসী দেশ হিসাবে পাকিস্তানের স্বরূপ আর কেউ না বুঝুক আমেরিকার বুঝতে বেশি দেরি হয়নি। তাই পাকিস্তানের গোপন ডেরা থেকে সন্ত্রাসের স্রষ্টাকে বার করে এনে তাকে নিকেশ করে ছেড়েছে। আর সেই সন্ত্রাসের সূত্রধরে ভারতের জন্ম কাশ্মীরের অভ্যন্তরে জঙ্গি পাঠিয়ে একের পর এক পাকিস্তান ভারতকে বিপন্ন করে তুলেছে তখন ভারতের কতিপয় রাজনৈতিক দলের মাতব্বর এবং তাদের সমর্থিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল এবং ভারতের অভ্যন্তরে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'কাশ্মীরের আজাদের' ধ্বনি তুলে তাদের সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছে। পাকিস্তান কর্তৃক সন্ত্রাস এবং কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের ইসলামিক মৌলবাদের আস্ফালনে কাশ্মীর ক্ষত-বিক্ষত। ওরা নিজেরা জানে না কার কবর কে খুঁড়ছে?

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

বাঙ্গলায় ভণ্ড বুদ্ধিজীবীদের রমরমা ও স্তাবকতা সব সময় ছিল এবং আছেও। তাই পশ্চিমবঙ্গ আজ আকৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ হলেও প্রকৃতিতে ইসলামিক চরিত্র পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ এই সমস্ত স্বদেশের শিকড়হীন বুদ্ধিজীবীরা কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ৪০ জন সৈন্যের মৃত্যুতে যতখানি না বিপন্ন তার চেয়ে বেশি সরব পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাতের বিরুদ্ধে। ভারতের সার্বভৌমত্ব যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, নিরাপদ থাকে, তার জন্য এরা ততটা চিন্তিত নয়, যতখানি চিন্তিত উগ্রপন্থীদের অধিকার রক্ষায়। নিরানব্বই জন উগ্রপন্থী মুসলমান হলেও উগ্রপন্থীদের কোনো জাত হয় না। ঠিক তেমনি এদের আক্রমণে স্বদেশের বিপদ বাড়লেও এরা বাদ্যযন্ত্রে টান দেন। দেশের সুরক্ষা ও উগ্রপন্থীদের মানবাধিকার দেওয়ার জন্য মিছিল করে নিজেদের অস্তিত্বও প্রমাণ করেন। যুদ্ধ কোনো সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। একথা পাগলেও জানে। তবুও আমরা ঘরের দরজা বন্ধ না করে বা প্রাচীর না দেওয়া ঘরে শান্তিতে কি থাকতে পারি? নেহরুর যুদ্ধহীনতা বা প্রতিরোধহীনতার জন্য তিব্বতের অস্তিত্ব আজ পৃথিবীর মানচিত্রে নেই। বুদ্ধের শান্তির বাণী এখানে ব্যর্থ হলেও মায়ানমার কিন্তু বাস্তববাদী বলে আজও মহাবিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পেরেছে। ধূর্ত নেকড়েদের হিংস্র নীতির কাছে, আমাদের 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই'-এর সুললিত বাণীই আমাদের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশকে অধিকৃত কাশ্মীরে পরিণত করেছে। শান্তিপ্রিয় বালুচদের দেশও আজ অস্তিত্ব হারিয়ে শয়তানের শাসনাধীন রয়েছে। সেখানে নিত্য হত্যালীলা চলছে। ভারতে ইসলামের শান্তির বান্দারা আজ দেশ বিপন্ন হলেও 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' বলে রাস্তায় ঘেউ ঘেউ করছে। শক্তিহীনকে কেউই সমীহ করে না। তার মুখে শান্তির বাণীও শোভা পায় না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৫টি শক্তিশালী দেশই ভেটো দেওয়ার অধিকারী। মহামতি অশোক বা গৌতমবুদ্ধের দেশ— এই ভারত সে তকমা থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ
৯এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্মেলন

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে আগামী ২৪ মার্চ বার্ষিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে হোমিও চিকিৎসক, ছাত্র ও অনুগামীদের অংশগ্রহণের আবেদন জানাই।

স্থান : 'স্বপ্নপূরণ'
গোয়াবাগান কমিউনিটি হল, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট, কলকাতা-৬
সময় : সকাল ৮-৩০ মি: থেকে বিকাল ৪-৩০ মি: পর্যন্ত
প্রতিনিধি শুল্ক : ৩৫০/-
যোগাযোগ :
ডাঃ ভাস্কর হাজরা—৯৪৩২৪৬০৪১০
ডাঃ অর্পণ চৌধুরী—৯৬৪৭৬৫৬২৪৫ ডাঃ রাজীব রায়—৯৪৭৪৩৬৫৮১৫

শুভেচ্ছান্তে
ডাঃ সুকুমার মণ্ডল
(সভাপতি)

সাহিত্যসেবী সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয় আঢ্য

''আমার তখন পইতা হইয়াছে। দুই কানে দুই সোনার মাকড়ি, মাথা নেড়া, পায়ে কাশীর জরির জুতা, পরনে গেরুয়া রঙের থান পেড়ে কাপড়, গায়ে গেরুয়া রঙের এক ভাগলপুরী বাপ্তার কোট। তখন আমি বোধহয় ফিফ্‌থ ক্লাসে পড়ি। স্কুলে যাইয়াই শুনিলাম, ইনস্পেক্টার ভূদেববাবু স্কুল দেখিতে আসিবেন। হেডমাস্টার ছিলেন— বাবু বেণীমাধব দে।

ঠিক বেলা দুইটার সময়, ভূদেববাবু আমাদের ক্লাসে আসিলেন। আমাদের মাস্টার ছিলেন— ঋষিকল্প পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়। ইঁহার কথা পরে কোনো সময় বলিব। ভূদেববাবু ক্লাসে আসিয়াই পার্বতীবাবুকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে কোলাকুলি হইল। আমি ক্লাসের প্রথম ছেলে। আমাকে দেখিয়া ভূদেব একটু হাসিলেন, বলিলেন, তোমার পইতা হইয়াছে? উত্তরে আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ'। 'তুমি সন্ধ্যা মুখস্থ করিয়াছ?' উত্তরে আমি বলিলাম 'হ্যাঁ।' 'বলো দেখি সন্ধ্যার সেই কথা?' আমি অমনি বলিলাম— 'মৈনস।' ভূদেববাবু হাসিলেন। এই সময়ে হেডমাস্টার বেণীবাবু ভূদেববাবুকে বলিলেন— ''জিজ্ঞেস করুন তো ওর বাপের নাম কী?'' আমি রাগ করিয়া বলিলাম, 'যা:।' কথা এই যে, আমার পিতৃদেবের নাম বেণীমাধব, আমাদের হেডমাস্টারের নামও বেণীমাধব। আমি পিতার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে হেডমাস্টার বেণীবাবু—'একটু ভুল হইয়াছে' বলিয়া আমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেন। ভূদেববাবুও সে রঙ্গের লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। আমার মহা রাগ হইল। শেষে ভূদেববাবু কাছে ডাকিয়া আমাকে একটু আদর করিলেন। আমাদের বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।''

এই বর্ণনার মধ্যে যে অন্তরঙ্গ পরিবেশের চিত্র ফুটে উঠেছে তা এযুগে দুর্লভ। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের থেকে একচল্লিশ বছরের ছোটো হলেও ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রতিনিধি। সাহিত্যসেবী সাংবাদিক পাঁচকড়ির মানস গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয়ার্ধের ভাবসংঘর্ষময় যুগপরিবেশের মধ্যে। যুক্তি-নির্ভরতা, হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বদেশপ্রেম ও সমাজ-কল্যাণ চিন্তা ছিল তাঁর মানস বৈশিষ্ট্য। তাঁর চিন্তাপ্রণালীতে বঙ্কিমচন্দ্র তথা বঙ্গদর্শন যুগের (বৈশাখ ১২৭৯—চৈত্র ১২৮৯) জের লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারায় উচ্চশিক্ষিত একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, ''১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্যচর্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম...।'' সাহিত্য চর্চাই তাঁর কাছে স্বদেশ সেবার অন্যতম উপায়, সমাজ- ভাবনার বাহক ছিল।

তাঁর স্বদেশ ভক্তির পরিচয় 'প্রবাহিনী'র একটি প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে— ''দশ দিক্ এমনই ভাবে অন্ধকারময় দেখিয়া কাতরকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিলাম। তখন মনে হইল— বটেই তো, আমার ভাষা-জননী আছেন, তিনি আমায় রক্ষা করিবেন, আমার বিশিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ইহাই বাঙালির সাহিত্য সেবার, সাহিত্য সম্মেলনের মূল কারণ।

...আমি বাঙ্গালার বাঙ্গালি। আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, জাতির ন্যস্ত ধন। সাহিত্য- সম্মিলন এই ভাবের উদ্বোধন আমাদের মনের মধ্যে করিয়া দিতেছে।

এই ভারতবর্ষের এক একটা অঙ্গ আমরা বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, সৌরাষ্ট্রীয়, আমরা প্রত্যেকে পুষ্ট এবং সবল হইলে সর্বাঙ্গ পুষ্ট এবং সবল হইবে, ভারতবর্ষের বিরাট সমাজ-শরীরে শক্তি এবং বল সঞ্চারিত হইবে। তাই এস বাঙ্গালি, আজ আমরা ভাষার ও সাহিত্যের সাহায্যে খাঁটি বাঙ্গালি হই, তাহার পর খাঁটি ভারতবাসী হইবার চেষ্টা করিব। সাহিত্য-সম্মিলন আমাদিগকে বাঙ্গালিত্বের উপাদান জোগাইয়া দিতেছে; সাহিত্য-সম্মিলন আমাদিগকে ভারতবাসী হইবার প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দিতেছে। সাহিত্য-সম্মিলনের জয় হউক।''

স্বদেশের মাটিকেই তিনি 'মা' বলেছেন। ''মাটি, তুমি সত্যই মা-টি। যাহার সর্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনন্ত। মা-টি আমার, তুমি স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। ...তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম, তুমি বাঙ্গলার বাঙ্গালির সর্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি।...

এই মাটি হইতেই বাঙ্গলার কার্পাস এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাষ আর সেই তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটি হইতেই অন্ন, তার সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা।''

তাঁর স্বদেশচিন্তা বিদেশি শাসকের প্রতি উপেক্ষার মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে— ''এতদিন পরে তোমার রোগের অনুভূতি এবং বোধোদয় ঘটিয়াছে, তাই তোমারই ভাষার নন-কো-অপারেশনের ডঙ্কা মারিয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে,

'যা রে বিদেশি বঁধু
আমি তোরে চাই না।'

তুমি করগ্রাহী রাজা আছ, তাহাই থাক; আমি কিস্তি কিস্তি তোমার টেক্স সকল আদায় দিব, তোমার আইন-কানুন মানিয়া চলিব, তোমায় দেখিলে দূর হইতে সভয়ে সাত সেলাম করিব। পরন্তু আর

উপযাচিকার ন্যায় তোমার ভজনা করিব না,...

জার্মান যুদ্ধে তোমার ইউরোপকে খুব চিনিয়াছি, পাঞ্জাবী কাণ্ডে— জালিয়ানওয়ালার বীভৎস ব্যাপারে--- তোমাকেও চিনিতে পারিয়াছে; নৈরাশ্যের মুকুরে আমার সর্বস্বহীন দেশের এবং জাতির ছবি আমি দেখিয়াছি। তাই পণ করিয়াছি, বাঁচি আর মরি, হারি বা পারি, আমরা কৃষ্ণকায় ভারতবাসী— 'ধলা পানে আর চাব না; তাহার প্রেমে আর মজব না; ধলার সঙ্গ আর করব না।' ইহাই আমাদের নন-কো-অপারেশন, ''স্বরাজ-প্রাপ্তির সাধনা অসহযোগের শবসাধনা।''

আবার ইতিবাচক দিকটির প্রতিও পাঁচকড়ির নজর এড়ায়নি। ''আজকালকার যুবজন জানেন কি, চুড়ি কিসের নিদর্শন? চুড়ি কো- অপারেশন-এর নিদর্শন। স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য, ধনী ও দরিদ্র, নর-নারী ও এই যুগের মধ্যে কো-অপারেশন ফুটাইবার এবং বজায় রাখিবার চুড়িই একমাত্র চিহ্ন। চুড়ি পরিতে বিক্রেতার জাতিবিচার কেহ করে না।...ওই শুন, পেশাবর হইতে পাবনা পর্যন্ত আর্যাবর্তে রব উঠিয়াছে— ''চুড়ি নিবি গো?''

অন্যদিকে স্বদেশের পূজায় তাঁর আহ্বান— ''এস এস, ভারতভূমির চারিবর্ণের নর-নারী, ভারতীয় সমাজের ছত্রিশজাতি এবং ছাপান্ন শ্রেণী, এস এস; ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল জাতি, তোমাদের নিজ নিকেতনে আবার ফিরিয়া আইস।...শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্তন করিতেছেন— তোমরা করিবে না কেন?

....তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে। তোমরা পর হইতে পার না, অপরের সহিত মিলিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে পার না। যখন নিজের অতীতকে ভুলিতে পার না, যখন ভারতবর্ষের জলবায়ু ও প্রকৃতির প্রভাব এড়াইতে পার না, যখন ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা তোমাদের মেদমজ্জার সহিত প্রথিত, বসার মধ্যে অনুস্যূত; তখন ইহাই তো প্রত্যাবর্তনের সময়। এই সময় ফিরিয়া এস না?''

পাঁচকড়ি একদিকে যেমন স্বদেশের পূজায় সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি যারা ইউরোপের অনুকরণে দেশাত্মবোধের কথা বলেন, তাদের প্রতি তীব্র কষাঘাত করতেও দ্বিধা করেননি। 'সম্মেলনের সখ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— ''সমাজ শরীরে বেদনার বোধ না হইলে, সমাজের ব্যাষ্টিসকল সে বেদনা দূর করিবার জন্য সম্মিলিত হইতে চাহেন না; —হইলেও তেমন সম্মিলনে কোনো ফলোদয় হয় না। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যে জাতি পরাধীন ও পরাজিত হইয়াছে, সে জাতির সংহতি-শক্তির অপচয় ঘটিয়াছেই, সে জাতির বাস্টি বা ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তায় উন্মত্ত আছেই, নহিলে পরাধীনতা ও পরাজয় সে জাতির ভাগ্যে ঘটিত না। আমরা পরাজিত পরাধীন, আমাদের সংহতিশক্তি বিপর্যস্ত, আমাদের সমাজের বহু ব্যক্তিই ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় নিজের নিজের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত। আমরা ইচ্ছা করিয়া কখনই সম্মিলিত হইতে চাহিব না— পারিবও না।

...তবু কেন আমরা সম্মিলিত হইতে চাই? ইহা ইংরেজি- শিক্ষাজাত এবং ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ জন্য সখের গুণ। আমরা ইংরেজি লেখাপড়া আয়ত্ত করিয়া তিনটি নূতন কথা শিখিয়াছি--- (ক) পেট্‌রিয়টিজম বা দেশাত্মবোধ, (খ) একতা বা সর্বজাতিক সমন্বয় এবং (গ) নেশন বা জাতির সৃষ্টি। কথাগুলি লিখিয়াছি বটে, তোতাপাখির মতন তাহার আবৃত্তি করি বটে, কিন্তু ইহার মর্ম্ম এবং মহিমা বুঝি নাই। দেশাত্মবোধের কথাটা যাহারা ঘন ঘন বলিয়া থাকে, তাহাদের প্রায় ষোল আনা পুরুষই ইউরোপীয় সভ্যতার অনুচিকীর্ষু...।''

কিন্তু তাই বলে স্বদেশভক্তি এদেশে যে নতুন কোনো ব্যাপার তা নয়। পাঁচকড়ি প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই স্বদেশভক্তির ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'তর্পণ' বিধির কথা উল্লেখ করেছেন। সুপ্রাচীনকাল থেকে তর্পণ এদেশের জনজীবনে অন্যতম কৃত্য।'' ...Patriotism-এর এমন প্রগাঢ় বিবৃতি, দেশাত্মবোধের এমন মূলস্পর্শিনী অভিব্যঞ্জন, এমন বিশ্বব্যাপী মহাভাবের বিকাশ— তর্পণ ছাড়া আর কিছুতেই হয় না, হইবার নহে। ...তর্পণে যেমন জাতিবিচার নাই, তেমনই ধর্মবিচার নাই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই তর্পণ করিতে সমান অধিকারী, সবাই সমানভাবে সাগ্রহে ও স্পর্ধার সহিত তর্পণ করিয়া থাকে। ইহা জাতির ধর্ম, National কর্তব্য, যে এই দেশের ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে এই দেশের অতীতে শ্লাঘাবোধ করিয়া থাকে, সে-ই তর্পণ করিতে পারে। ...এমন মহাভাবপূর্ণ জাতির উদ্বোধনসূত্র সমেত ধর্মকার্য নেই বলিলেও চলে।''

স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষ্য করি পাঁচকড়ির রচনায়। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে 'স্বদেশমন্ত্র' অংশে স্বামীজী ভারতবাসীকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রার্থনা করেছেন— ''মা আমায় মানুষ কর।'' পাঁচকড়িও লিখেছেন— ''সর্বাগ্রে মানুষ হইতে হইবে। মানুষের মতন মানুষ হইয়া তবে তো অন্যবর্ণের মানুষের সহিত সমকক্ষতা করা চলিবে। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান তোমাদের ছিল তো সব, গেল কেন সব? সব হইয়াছ বলিয়াই তোমাদের সব গিয়াছে। আবার যদি শবত্ব বর্জন করিয়া শিব হইতে পার, ''যত্র জীব তত্র শিব'' এই বোধে উদ্বুদ্ধ হইতে পার, তবে পূর্বে যেমন মেদিনীমণ্ডলকে লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে পারিতে, এখনও আবার তেমনই অপূর্ব খেলা খেলিতে পারিবে।''

দুর্গাপূজার মধ্যেও পাঁচকড়ি স্বদেশভাবনা লক্ষ্য করেছেন— ''তন্ত্র বলিতেছেন, —প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক মনুষ্যের দুই জননী।...দ্বিতীয়া দেশমাতৃকা, যে দেশে জনক-জননী পুরুষানুক্রমে বাস করেন, যে দেশের পত্র, পুষ্প, ফল, ক্ষীর, নীর উপভোগ করিয়া জনক-জননীর দেহে রেতাদির পুষ্টি ও সঞ্চয় ঘটে। দেহস্থ আত্মাকে চিনিতে পারিলে দেশস্থ আত্মার পরিচয় পাইবে। ...এই হেতু বাঙ্গালির দুর্গোৎসব দেশাত্মমূলক এবং দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। ...এই উৎসব করিলে সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত সকলেই উদ্বুদ্ধ হইবে— সকল জাতি, সকল বর্ণ, সকল কারিগর, সকল হুনরী, সকল ব্যবসায়ী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, আচণ্ডাল সবাই উদ্বুদ্ধ হইবে। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব বাঙ্গালির মহোৎসব।''

'শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা' প্রবন্ধে স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর কাতর আবেদন ধ্বনিত হয়েছে। ''শেষে এইটুকু বলিয়া রাখিব যে, জগদ্ধাত্রীপূজা বাঙ্গালির বিশিষ্টতার বিজয় নিশান। ...আর কোনও দেশে কোনও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পূজা, এমন সাধনা প্রচলিত নাই। ইহা বাঙ্গালার নিজস্ব, বাঙ্গালির নিজস্ব। অথচ তন্ত্র বলিতেছেন যে, এই দেবী এবং ইহার বীজমন্ত্র অতি পুরাতন এবং সনাতন। হায় বাঙ্গালি! ইউরোপের ছাইভস্মে এখনও মুগ্ধ হইয়া আছ, একবার নিজের দিকে তাকাও না— দেশ, সমাজ ও জাতিকে চিনিবার চেষ্টা কর না? তোমার জীবন সার্থক হইবে।'' ■

মোর ঘুমঘোরে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

তুই কখনো পরি দেখেছিস— বলে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুনীতি। আমিও অনেকক্ষণ ভাবি। ভেবেও শেষ পর্যন্ত মনে পড়ে না, পরি দেখেছি কিনা। স্বপ্নেও দেখেছি, সেরকম কিছুও মনে পড়ে না।

দেখিসনি, না— আবারও উৎসুক হয়ে জানতে চায় সুনীতি।

মনে করতে পারছি না, সত্যিই দেখিনি— অবশেষে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো মুখ করে বলি আমি।

—আমি দেখেছি জানিস তো। দেখেছি মানে রোজই দেখি, প্রায়ই।

—কখন দেখিস?

—অনেক রাতে। তোরা তখন ঘুমিয়ে। চারদিক শুনশান। শুধু বাড়ির পাশের বাগানে ছাতিম ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর দু-একটা কুকুর ডেকে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। ঠিক তখন আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি উঠি। চুপি চুপি ছাদে চলে যাই। আর তখনই ছাদে পরি নেমে আসে।

—পরি নেমে আসে? তুই দেখেছিস পরিকে? ছুঁয়ে দেখেছিস?

—সত্যি বলছি। এই তোর গা ছুঁয়ে। তোকে এখন যেমন দেখছি, তেমন করে দেখেছি পরিকে। সে যে কেমন দেখতে সে কী করে তোকে বোঝাই। কুয়াশার ভিতর থেকে পরি নেমে আসে। সাদা গাউন পরা। আমার দিকে তাকিয়ে খুব হাসে। হাসির দমকে পরির সারা শরীরে ঢেউ ওঠে। দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে আসে আমাকে। হাওয়ায় তার চুল ওড়ে। আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে পরি নাচতে থাকে। আর গান গায়।

—গান গায়? কী গান?

—ওই যে রে, ওই গানটা...মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর...নমো নমো...নমো নমো...নমো নমো...

—তুই তাহলে পরির গানও শুনেছিস?

কোনো উত্তর দেয় না সুনীতি। কী যেন ভাবতে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে। দূরে ময়দানের ওপর দিয়ে ট্রাম চলে যায়। শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে। দুটো ক্লান্ত কাক চক্কর কেটে কেটে কোথায় যেন উড়ে যায়। আমার দিকে ফিরে সুনীতি বলে— বিশ্বাস করলি না, তাই তো?

—না, না, বিশ্বাস করব না কেন, তুই বল।

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুনীতি। আমার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে— আমি পরির একটা নাম রেখেছি, জানিস তো। জোছনাময়ী। একদিন ওকে তোরাও দেখতে পাবি। সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করবি তোরা।

আমি বুঝতে পারি না, সুনীতির চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক রকমের চকচকে হয়ে ওঠে কিনা। আসলে সুনীতির সঙ্গে আমার এ ধরনের কথাবার্তাগুলো হয়েছিল এক বছর আগে। তখন সুনীতি আমার বন্ধু ছিল। আর তখন থেকেই সুনীতি অল্প অল্প করে পাগল হয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন কী একটা কারণে সুনীতির

স্কুল হাফ ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ও বিকেলের দিকে চলে এসেছিল আমার অফিসে। অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা দুজন গিয়ে বসেছিলাম ময়দানে। আর সেদিনই সুনীতি আমাকে প্রথম পরির গল্প শুনিয়েছিল। আমি অবাক হয়ে শুনেছিলাম। আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল, এ সুনীতি নয়। অন্য কেউ, অন্য কোনো জগৎ থেকে নেমে এসে আমাকে গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে।

—জানিস তো, পরির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।

—কী করে বুঝলি?

—এখন পরি ছাদে নেমে আসার আগে আমাকে ডাকতে থাকে। আয়, আয়, বলে ডাকে। আমি ঘুমের মধ্যে সে ডাক শুনতে পাই। যেন কোন দূর থেকে কেউ আমাকে ডেকে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে আমি তাড়াতাড়ি ছাদে চলে যাই। তখন আকাশ থেকে, মেঘের ওপর থেকে পরি নেমে আসে। আমরা মুখোমুখি বসি। গল্প করি সারারাত।

—কী গল্প করিস?

—ও তুই বুঝবি না। তুই কি কখনো পরি দেখেছিস যে বুঝবি? বলে একচোট হেসে নেয় সুনীতি। তারপর বলে— তা এতবার জানতে চাইছিস যখন, তখন বলি। জানিস তো, পরি সেদিন আমার হাতটা ওর হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলল— অ্যাই, তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে? আমি আর কী বলি? অত চট করে কি ভালোবাসার কথা বলা যায়? আমি হাঁ করে পরির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পরি খিলখিল করে হেসে উঠল।

সুনীতি পাগল হয়ে যাচ্ছে— আমি বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু সত্যিই সুনীতি পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা— সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, আবার বুঝতে পারছিলাম না— এই দুইয়ের মাঝখানে একটা অদ্ভুত অবস্থার ভিতর ছিলাম আমি। সুনীতি একটা স্কুলে অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিল। খুব মন দিয়ে ক্লাসে অঙ্ক করাতো, কোনোদিন ফাঁকি দিত না। ছাত্ররা ওকে খুব ভালো বাসত। মাস্টারমশাইরাও। এরকম একটা মানুষকে আমি পাগল বলি কী করে। তাই সুনীতি পাগল হয়ে যাচ্ছে বুঝেও আমি সুনীতিকে পাগল বলতে পারছিলাম না। শুধু বাড়িতে ফিরে এসে আমার বউকে বলেছিলাম কথাটা। বউ শুনে বলেছিল— পাগল না ছাই। নিশ্চয়ই ড্রাগ খায়। এখন তো ড্রাগ অনেকেই খাচ্ছে। সুনীতি যে পরি দেখেছে, আমার বউ বিশ্বাস করতে চায়নি।

আবার কিছুদিন পরে সুনীতি এসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত শরীর যেন খুশিতে টইটুম্বুর হয়ে রয়েছে। মুখে এক স্বর্গীয় তৃপ্তির আভাস। মনে হচ্ছিল এ জীবনে যা পাওয়ার সবই যেন পাওয়া হয়ে গিয়েছে সুনীতির। আবার আমরা গিয়ে ময়দানে বসেছিলাম। সেদিনও পড়ন্ত বিকেলের আলোয় সুনীতি আমাকে পরির গল্প শুনিয়েছিল।

—জানিস, কাল পরির মুখটা আমার দুহাতের তালুর ভিতরে নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। পরি বলল, কী দেখছ অমন করে? আমি বললাম—তুমি কোথা থেকে এসেছ? পরি বলল, সে অনেক দূর। মেঘের ওপরে মেঘ, তার ওপরে আরও আরও অনেক মেঘ। সেই মেঘের সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসি আমি।

—তাহলে তো পরি তোকে ভালোবাসে— ঠাট্টা করার সুরেই বলি আমি।

—তা বলতে পারিস। জানিস তো, আমি এখন পরির সঙ্গে ঘরসংসার করি। পরি আমাকে রান্না করে খাওয়ায়। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আমি ঘুমিয়ে পড়লে পাশে শুয়ে পরিও ঘুমিয়ে পড়ে।

শিশুর মতো উদ্বেল হয়ে ওঠে সুনীতি। আমার সুনীতিকে দেখে কষ্ট হতে থাকে খুব। খুব নরম স্বরে ওকে জিজ্ঞেস করি— পরির কথা আর কাউকে বলেছিস নাকি রে?

—নাহ্, তোকেই শুধু বললাম। আর কেউ তো বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু, সত্যিই সুনীতি পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা, এরপরও তা আমি সত্যি সত্যি বুঝে উঠতে পারিনি। কী করেই বা বুঝব। কারণ, এরপরও সুনীতি নিয়মমতো স্কুলে যাচ্ছিল। ক্লাসে অঙ্ক শেখাছিল। ওকে নিয়ে তো কারো কোনো অভিযোগ ছিল না। ক্লাসে অঙ্ক শেখাতে গিয়ে ও তো কোনো ভুলও করেনি। শুধু মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত সুনীতি। ময়দানে গিয়ে বসতাম আমরা। আর তখন ও পরির গল্প শোনাতো আমাকে। একদিন সুনীতির হাত দুটো ধরে দেখলাম, সে হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। কেমন খসখসে। শুধু চোখ দুটো ওর আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। সুনীতি অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল— কী দেখছিস বল তো?

—তোকে। তোর শরীরটা ঠিক আছে তো সুনীতি?

—একদম। আমাকে নিয়ে ভাববি না।

বেশ যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন শুনলাম সুনীতিকে পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেনি সুনীতি। সব জায়গায় খোঁজ করা হলো। চারদিকে লোক পাঠানো হলো। পুলিশে ডায়েরি করা হলো। কিন্তু কোথাও সুনীতিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। যেমন হঠাৎ করেই হারিয়ে গিয়েছিল সুনীতি, সাতদিন পরে ঠিক তেমনই হঠাৎ করেই আবার ফিরে এল। কোথায় গিয়েছিল কাউকে কিছুতেই বলল না। শুধু মিটিমিটি হাসতে থাকল। যেন রহস্য করছে। আমি হাত ধরে ওকে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে গেলাম। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম— কাউকে না বলে কোথায় গিয়েছিলি তুই?

—ও মা, কোথায় আবার যাব? বেড়াতে গিয়েছিলাম পরির সঙ্গে।

—বেড়াতে গিয়েছিলি? কোথায়?

—হ্যাঁ রে, আমি আর পরি হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম তো। তারপর মাঝপথে একটা স্টেশনে নেমে পড়লাম। লাল সুড়কি বিছানো প্ল্যাটফর্ম। রেল লাইনের দুধারে ধানখেত। যতদূর চোখ যায় খেত ভরা শুধু ধান আর ধান। দু-একটা ফিঙে আর শালিখ ওড়াউড়ি করছে এদিক ওদিক। আমি আর পরি হাত ধরাধরি করে আলপথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। এরকম হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম একটা নদীর ধারে। নদীর ঘাটে মাঝি নৌকো নিয়ে বসেছিল। মাঝিকে পয়সা দিয়ে নদী পেরলাম আমরা। নদীর ওপারে যে গ্রাম, সেখানে আমি আর পরি সংসার পেতে বসলাম। কত ভালোবাসলো পরি আমাকে। তারপর একদিন পরি ওর দেশে ফিরে গেল। আমিও ফিরে এলাম এখানে।

সেদিন, প্রথম, আমার ভিতরে একটা ভয় ঢুকে গেল। সুনীতিকে দেখে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। মনে হলো, ও যেন সুনীতি নয়। কোনো অলৌকিক জগৎ থেকে অবয়বহীন কোনো স্বর যেন নেমে এসেছে

এই পৃথিবীতে। কুয়াশার ভিতর সে আমাকে শুনিয়ে যাচ্ছে পরির গল্প। অথচ সুনীতি তো অন্য কিছুই করেনি। শুধু পরির গল্পই শুনিয়েছিল আমাকে।

সেদিন আর সুনীতির সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকলাম না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম। বউ সব শুনে গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবল অনেকক্ষণ। তারপর বলল— বিষয়টা খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে আমার। ড্রাগের নেশা থেকেও এরকম হ্যালুসিনিশন হয়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে ওকে। কাউন্সেলিং করালে সেরে যাবে।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি মালবিকাকে খবর দিলাম। মালবিকা খুব ভালো মেয়ে। ব্যাঙ্কে চাকরি করে। সুনীতি মালবিকাকে খুব ভালোবাসে। ওরা দুজনে বিয়ে করবে ঠিক করেছে। ওদের দুজনের বাড়ির লোকও জানে। বিয়ের কেনাকাটাও শুরু হয়ে গেছে। খবর পেয়ে মালবিকা একদিন আমার অফিসে এল। অফিস থেকে বেরিয়ে থিয়েটার রোডের একটা কফিশপে বসলাম আমি আর মালবিকা। সব শুনে মালবিকা চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। আমি ওকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম। বললাম— এটা এমন কিছু না। ঠিক হয়ে যাবে। একটু কাউন্সেলিং দরকার সুনীতির।

মালবিকা আনমনে টেবিলের ওপর নখ দিয়ে আঁকিবুকি কাটছিল। সেইদিকে দেখতে দেখতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম— আচ্ছা, তোমার কাছে সুনীতি কখনো পরির গল্প করেনি?

—না তো। প্রতি শনিবারই তো আমাদের দেখা হয়। এই তো গত শনিবার আমরা সিনেমা দেখলাম। তারপর মেনল্যান্ড চায়নায় খেলাম। কই কিছু বলেনি তো!

—আশ্চর্য!

মালবিকা আনমনে টেবিলের ওপর নখ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ আঁকিবুকি কাটল। তারপর বলল— আচ্ছা, আমাকে ও পরির গল্প বলল না কেন বলতে পারেন?

—কী জানি হয়তো বলতে চায়নি।

—হতে পারে। তবে পরি সত্যিই আসে কিনা তাই বা কে জানে। আনমনেই বলল মালবিকা। যেন স্বগতোক্তি। সুনীতিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মালবিকা আর সুনীতির বাড়ির লোকেরা ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার কী বলেছিল, তা আমি জানি না। শুধু ডাক্তার দেখিয়ে আসার পর অনেকদিন সুনীতি আমার কাছে আসেনি। তারপর হঠাৎই একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির। লক্ষ্য করে দেখলাম, এই কদিনে বেশ রোগা হয়ে গেছে সুনীতি। দু চোখের কোণে একটু কালিও পড়েছে। গালে না কামানো দাড়ি। চোখে সেই উজ্জ্বলতা নেই। বরং কেমন যেন বিষণ্ণতার ছায়া। একটু জড়োসড়ো হয়ে গুটিয়ে বসেছিল সুনীতি। সুনীতিকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল আমার। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। বললাম—শরীরটা কি খুব খারাপ সুনীতি?

—নাহ্।

—তাহলে এরকম লাগছে কেন?

—ও কিছু না।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই সুনীতি জিজ্ঞেস করল— তোরা সবাই ভাবিস আমি পাগল হয়ে গেছি, তাই তো?

—না, না, এরকম ভাবতে যাব কেন?

—ভাবিস। আমি জানি। আসলে তোরা বিশ্বাসই করতে চাস না আকাশ থেকে পরি নেমে আসে।

কী আর বলব। চুপ করে বসে রইলাম আমি। সুনীতিও চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, আমার হাতদুটো চেপে ধরে, যেন দূরাগত কোনো দ্বীপ থেকে কথা বলছে, ঠিক তেমনই রহস্যময় কণ্ঠে বলে উঠল— বিশ্বাস কর। সত্যিই মেঘের আস্তরণ সরিয়ে সরিয়ে পরি নেমে আসে। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, নিশুতি রাতে, পরি নেমে আসে। আমাকে ডাকে, আমাকে গান শোনায়, আমার সঙ্গে খেলা করে। তোরা তাকে দেখতে পাস না। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাই। আমি তাকে স্পর্শ করি। কথা বলি তার সঙ্গে। তার সঙ্গে আমি বেড়াতে যাই। পরি যে সত্যি সত্যিই নেমে আসে, একদিন না একদিন তোরা ঠিক বুঝবি, বুঝবিই।

পরি সত্যি সত্যিই নেমে আসে কিনা, তা আমার আর জানা হয়নি। কিন্তু এরপর সুনীতি সত্যি সত্যিই একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। স্কুলে অঙ্কের ক্লাস করাতে করাতে হঠাতে চক-ডাস্টার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু-হাত ছড়িয়ে গেয়ে উঠেছিল— মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর...নমো নমো...নমো নমো...নমো নমো। ছাত্ররা ভয় পেয়েছিল। ক্লাস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সবাই। পাশের ক্লাস থেকে মাস্টারমশাইরা ছুটে এসে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। সুনীতির কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে শূন্য ক্লাসে ঘুরে ঘুরে নাচছিল আর দু'হাত ছড়িয়ে গান গাইছিল। কেউ সুনীতির কাছে ঘেঁষতে চাইছিল না। সবাই ভয় পাচ্ছিল ওকে। এরকম দু'হাত ছড়িয়ে গান গাইতে গাইতেই সুনীতি স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। হারিয়েই গিয়েছিল আমাদের সুনীতি।

এসব একবছর আগেকার কথা।

* * *

আমি একটু আগে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছি।

সন্ধের মুখে মুখে প্রান্তিক থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। কলকাতা ফিরব। জানালার ধারে আসন। ট্রেনটা পিচকুড়ির ঢালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সিগনাল পায়নি। আজ পূর্ণিমা। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখি, বাইরের মাঠঘাট ধু ধু জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। লাইনের ধারে ঝোপঝাড়, নয়ানজুলি, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা তালগাছ— এই জ্যোৎস্নায় সবই কেমন যেন অপার্থিব। যেন এই পৃথিবীরই আর কেউ নয় তারা আর এখন। এই অপার্থিব জ্যোৎস্নায় ওই আশ্চর্য দৃশ্যটা দেখে ফেললাম আমি।

দূরের ওই আলপথ ধরে হেঁটে চলেছে এক পুরুষ আর রমণী। রমণীটি বড় উচ্ছল। মাঝে মাঝেই হাসতে হাসতে সে ঢলে পড়ছে পুরুষটির গায়ে। আর পুরুষটির কোলে একটি শিশু। পরম যত্নে, পরম আশ্লেষে সে জড়িয়ে রয়েছে শিশুটিকে। শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে সে ভোলাচ্ছে শিশুটিকে। জ্যোৎস্নায়, ওই আলপথ ভেঙে রমণীটিকে সঙ্গে নিয়ে পুরুষটি চলে যাচ্ছে দিগন্ত পেরিয়ে।

পুরুষটির মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এই নৈঃশব্দ্যে, এই অপার্থিবতায় আমি বেশ চিনতে পারছি তাকে। বুঝতে পারছি, আমাদের সুনীতি পরির সঙ্গে ঘর বাঁধতে পেরেছে।

গল্প

উহাদের কথা ও কাহিনি

সুমিত্রা ঘোষ

আমি দেবেন বিশ্বাস, ট্রেন ড্রাইভার। ট্রেনিংয়ের পর মালগাড়ি চালিয়ে হাত মকশো করতে হয়েছে, তারপর প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালাবার অধিকার লাভ করেছিলাম। এখন সুপারফাস্ট ট্রেন চালাই। যখন যে ডিভিশনে থাকি চলতে চলতে কত রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, কখনও বন্ধুত্বও গড়ে ওঠে তার ইয়ত্তা নেই। স্টেশনগুলোয় কত সুখ-দুঃখের কাহিনি খুঁজে পাওয়া যায়, যার খবর প্যাসেঞ্জারদের জানার কথাই নয়, সব রেলকর্মীরাও জানে এমনও নয়। জানার জন্য চোখ-মন দুটোই খোলা থাকলে জানা যায় স্টেশনের প্রাণ আছে, সুখ-দুঃখ আছে, জীবনের গল্প আছে। এরকম একটা কাহিনি আজ মনে পড়ে গেল যাদের কথা কেউ জানতে চায় না, কেউ লেখে না, মানুষ বলেও মনে করে না।

তখন রাঁচী এক্সপ্রেস চালাই। হাতিয়ায় ট্রেন লাগিয়ে দিয়ে রাঁচীতে চলে আসতাম। কারণ রাঁচী স্টেশনে দুজন বন্ধু জুটেছিল। হুইলার বুক স্টলের সনাতন মুর্মু আর আরপিএফ-এর কর্তা কিশোর সিংহ। একদিন কিশোর সিংহের কেবিনের সামনে প্ল্যাটফর্মে দুটো চেয়ারে বসে গল্প করছি সেই সময় পিঠে এক বস্তা যাত্রীদের ফেলে যাওয়া মিনারেল ওয়াটারের বোতল আর কোলে একটা বছর খানেকের ন্যাংটো বাচ্চা নিয়ে সেই বনবাসী বৌ-টি আমাদের সামনে এসে বসল। আঁচলে ঘাম মুছে বস্তা থেকে একটা অল্প জল সুদ্ধু বোতল বের করে নিজেও খেল, ছেলেকেও খাওয়ালো। ওকে আমি আগেও দেখেছি। মসৃণ কালো পাথরের মতো মুখের চামড়া, বড়ো বড়ো দুটো চোখ, ছিপছিপে শরীর, সিঁথিতে মেটে সিঁদুর, হাতে কাঁচের চুড়ি। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের স্ট্যাম্প মারা এক যুবতী বধু। আমার বরাবরই আগবাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব। জানতাম এরা বাংলা বোঝে, ভাঙা বাংলায় কথা বলতেও শিখে যায় ট্রেন থেকে জীবিকার উপাদান সংগ্রহ করতে করতে। জিজ্ঞেস করি— 'এক বস্তা বোতল দিয়ে কত টাকা পাও?'

—'বেশি নহি বাবুজী, মহাজন তিশ ঠো রুপয়া দেয়।'

—দিনে ক'বস্তা পাও?

—'অভি তো দেড় সে দো বোড়িয়া। তেওহার-পরবের সময় দশ-বারা মিলে যায়।'

—'মর্দ কী করে তোমার?'

—'কুছো না। দিন-রাত দারু কা নশা করে, পইসার লেঙ্গে গলা দাবিয়ে ছিনে লেয়।'

—'তাহলে চলে কী করে? খাও কী?'

—'কুখাকে চলবে? আয়ে দিন মুড়মুড়ে (মুড়ি) খাই। বোউয়াকো এক-দো রোটি কিনে দেই ঔর আমার দুধ পি লেয়। ভরপেট খানা মিলে না বাবুজী।'

সেই পুরনো কাহিনি। রেলের চাপরাশির ছেলে আমি, জানি গরিবী কাকে বলে। পার্স থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে এগিয়ে দিয়ে বললাম— 'নাও, আজ ভরপেট খানা খেয়ো।'

আশ্চর্য! ও হাত বাড়ালোই না। সরল দুচোখে অচেনা এক ভাষা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নীচু করে বিনম্র গলায়

বললো—'নহি বাবুজী; বিন্ কাম কিয়ে রুপয়া লেনা ভিখ মাঙ্গনেকা বরাবর হোতা হ্যায়।'

হতবাক আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিশোর সিংহ ইশারায় বারণ করল। মেয়েটি আমাদের দুজনকে— 'পরনাম বাবুজী' বলে বস্তা-বাচ্চা নিয়ে চলে গেল। ও যাওয়ার পর কিশোর বললো— 'ওর নাম মোতিয়া, বরের নাম ঝংডু। স্টেশনের পেছনদিকে ঝোপর পট্টিতে থাকে। ট্রেন না থাকার অবসরে এখানে এসে বিশ্রাম করে। ও কারও সাহায্য নিতে চায় না। আমার জওয়ানদের জন্য লঙ্গর থেকে লাঞ্চ আসে রোজই খাবার বেঁচে যায়। মোতিয়াকে প্রথম দিকে খাবার দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ও কিছুতেই নেবে না। উপোস থাকবে তবুও কারও করুণা নেবে না। এতো আত্মসম্মান বোধ ওর। কুলি থেকে হকার সবাই ইজ্জত দেয় ওকে। ঝংডু বেধড়ক মারে বলে একদিন ওকে বলেছিলাম— তুই চাইলে ঝংডুকে তুলে অনেক দূরে এমন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে আসব যে দারু তো দূর, ফিরে আসার পয়সাও পাবে না। ও আমার পায়ে পড়ে বললো— না-না বাবুজী! ও তাহলে না খেয়ে মরে যাবে। আমরা পেয়ার করে বিহা করেছিলাম। ও নেশা ধরার আগে আমাকে বহোত পেয়ার করত। তাছাড়া ও যে বৌউয়ার বাপ গো বাবুজী! ঝংডুর নেশা করা বন্ধ করতে পারি আমি কিন্তু মোতিয়া রাজি হবে না।'

মোতিয়ার সঙ্গে দেখা হতো। পরনের কাপড় খানার অন্তিম দশা কিন্তু কিছু করার নেই। এ মেয়ে স্টিম ইঞ্জিনের বয়লারের আগুন।

* * *

অঘ্রানের শেষ। ঘন কুয়াশা। টাটানগরের পর প্রচুর স্পিড দিই কিন্তু এখন সেটা চলবে না তাই নচ্ নামা ওঠা করে স্লো মোশনে। মুরি থেকে গোরুর গাড়ি। হঠাৎ তীব্র আলোয় দূরে একটা অবয়ব দেখলাম। অটোমেটিকালি ব্রেক টাচ করে থামলাম। আর একটু কাছে আসতে বুঝলাম সামনে ওপেন কালভার্টের ওপর শাড়ি পরা এক মূর্তি মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ইমারজেন্সি ব্রেক লাগাই। ক্যাঁ...চ করে শব্দ করে চাকা লাইন কামড়ে একটা ঝট্কা দিয়ে থেমে পড়ে। লাফ দিয়ে নেমে দৌড়ে গিয়ে হাত ধরে টেনে এদিকে নিয়ে আসি। —'অ্যাই! কী করতে যাচ্ছিলি তুই!' —কোলে বৌউয়াকে নিয়ে মোতিয়া যেন বেহোঁশ একটা পাথরের মূর্তি। গার্ড সাহেব আর যাত্রীদের মিলিত চেষ্টায় ওকে কামরায় তুলে রাঁচী স্টেশনে এনে আরপিএফয়ের হাতে দিয়ে বলে দিলাম— 'সিংজীকে বলো এ স্যুইসাইড করতে গিয়েছিল। হাতিয়ায় ট্রেন রেখে আধ ঘণ্টায় ফিরে আসব আমি।'

ফিরে এসে যা শুনলাম তাতে স্তম্ভিত। মোতিয়া চেতনায় ফিরে গত রাতের বিবৃতি দিয়েছে কিশোরকে। কাল রাতে বৌকে মারধোর করেও দারুর পয়সা বের করতে না পেরে এক কুলির কাছে দুশো টাকায় বিক্রি করে কুলিকে ঘরে ঢুকিয়ে চলে গেছে ঝংডু। ইজ্জত বাঁচানোর জন্য মোতিয়া বটি দিয়ে কুলিকে কোপ মেরে সক্কাল বেলায় মরবার জন্য লাইনের ওপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মোতিয়া। —'সর্বনাশ! এটা তো অ্যাবেটমেন্ট টু স্যুইসাইডের কেস স্যার! কেস হবে তো!' কিশোর বললো— 'সবই হবে তবে আমার আদালতে। এসব কোর্টে নিয়ে যাই না। নিত্যকার ঝামেলা দেবুদা। এগুলো এই ঘরেই সেরে ফেলি। আপনি শুধু দেখুন বসে।'

ঝংডুকে ঘরে আনা হলো। ও নেশার ঘোরেই আছে দেখেই বুঝলাম। হেলদোলও নেই। হাতে হ্যান্ডকাফ লাগালো। ও কথাও বললো না। জওয়ানটা যেই লাঠি দিয়ে পেছনে দুঘা দিল তখন চেঁচাতে লাগল। বাইরে বসা কুলিরা উঠে দাঁড়িয়েছে। ওদের সামনে দিয়ে ঝংডুকে মারতে মারতে নিয়ে গেল ব্যারাকের গারদে। ওরা চলে যেতেই অন্য এক জওয়ান একটা কুলিকে নিয়ে এলো। সে এসেই কিশোরের পায়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করে দিল— 'গলতি হো গয়া। মাফ কর দো হুজুর! দোবারা কভি নহী হোগা।' দমাদম ওর পিঠে লাঠি মারতে মারতে হুজুর বলতে থাকল— 'মোতিয়া পর তেরা বুরি নজর থা শালে? এক শরাবিকা ফ্যাদা উঠাকে তু নে উসকি বিবি কো রেন্ডি বনানা চাহা থা? উঠ্ শালে। বর্দি উতার, নাম্বার প্লেট খোল হাত সে শুয়োর কা ঔলাদ।'

লোকটা আর্তনাদ করে ওঠে— 'নহী নহী বরখাস্ত মত করো সাহাব। বিবি-বচ্চে ভুখে মর জায়েঙ্গে ঔর কোই সাজা দে দো পর বর্দি না উতারো মাই-বাপ!' কিশোর বাঘের গর্জন করে ওঠে— 'য়্যে তেরা নানিআল নহী পুলিশ চৌকি হ্যায়। ঝংডু কো জেল ভেজা ঔর তুঝে ছোড় দুঁ? কিঁউ বে শালে হারাম খোর? কুত্তা...(অশ্লীলগালি)।'

এই সময় বাইরে থেকে কুলি সর্দার বললো— 'হুজুর ইসকো তিনগো ছোটে ছোটে বচ্চে হ্যায় ঔর বিবি ফির পেট সে হ্যায় জী। আপ মুচলেকা লিখাও, থোড়ে দিনকে লিয়ে হাজত মে ডাল দো, জুরমানা কর দো, খুব পিটাই করো, পর বরখাস্ত মত্ করো। ইসকা পরিবার সচমুচ বিখর জায়গা হুজুর! কৃপয়া জেল মত্ ভেজো সাব। কোর্ট-কাছেরি হাম জ্যাসা মুরখ ক্যা জানে? আপ হি হমারা সবকুছ হো হুজুর!'

কিশোর এবার চেয়ারে বসে বললো— 'লেকিন দোবারা য়্যাসা খিলোনে হড়কত করেগা তো?'

—'হাম মুচলেকা মে অঙ্গুঠা দেঙ্গে না! করেগা তো আপ মেরে উপর ভি মুকদ্দমা জরুর দর্জ করেঙ্গে।'

এরপর কিশোর নিজের আদালতের রায় ঘোষণা করল। দশরথ কুশবহাকে দশ দিনের গারদ, মুচলেকাতে নিঃশর্ত সহি, মোতিয়ার খুদকশি করার চেষ্টার কারণের দায়ে দশ হাজার টাকা জরিমানা হলো। দশরথকে লাল জামা, নম্বর প্লেট খুলে রেখে কোয়ার্টার গার্ডে যেতেই হলো। সর্দার কোথা থেকে ক্যাশ টাকা জোগাড় করে জরিমানা ভরলো। —বাহ্! রীতিমতো জটিল একটা অ্যাবেটমেন্ট টু স্যুইসাইড কেসকে এক ঘণ্টায় নিষ্পত্তি করে ফেললো কিশোর সিংহ বিনা ঝঞ্ঝাটে।

সবাই চলে গেছে। রিলাক্সড হয়ে বসে চায়ের আদেশ দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললো— 'মোতিয়া ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে বলে আমার কাছে দু-পাঁচ টাকা করে জমা করে। এই টাকা দিয়ে পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান করে দেব ওকে। এই মেয়েটাকে আমি বড়ো ইজ্জত করি দেবুদা, কারণ আনপড় গাওয়ার বুভুক্ষু হয়েও মোতিয়া অনন্য সাধারণ। আমি এখানে থাকতে থাকতে ওর জন্য কিছু করে যেতে পারলে খুব ভালো লাগবে। ও সম্পূর্ণ খাঁটি একটা মেয়ে মেকি নয়!' জিজ্ঞেস করি— 'যার জন্য এতো নাটক সে কোথায়? তাকে দেখছি না তো?

—'হবে কোথাও।' —চায়ে চমুক দিয়ে কিশোর বলে— 'বড়ো জব্বর ঝটকা খেয়েছেও। স্বামী ধরে পিটোবে এটা ওদের কাছে অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু নেশার পয়সার জন্য ওকে বিক্রি করে দিতে পারে ঝংডু এটা মোক্ষম আঘাত হয়ে বুকে বিধেঁছে। কেমন যেন উইথড্রন হয়ে রয়েছে।'

কিশোর সিংহকে যত দেখি ততই অবাক হই। কে বলে পুলিশ মানেই ঘুষখোর দুর্নীতিগ্রস্ত? ভূপেন হাজারিকার প্রিয় গানটা মনে গুনগুন করে— 'মানুহ মানুহের বাবে' অর্থাৎ মানুষ মানুষের জন্য। কিশোরই তো জ্বলন্ত প্রমাণ! রাতে গাড়ি নিয়ে ফিরতে হবে তাই বিদায় নিয়ে চলে এলাম। কিশোর মুখে না বললেও আমি জানি কুলি দশরথ ওর 'কোয়ার্টার গার্ডের' গারদে ১০ দিন আড়ং ধোলাই খেয়ে বেরিয়ে এসে লাল জামা গায়ে আবার কুলিগিরি করবে, কিন্তু ঝংডুর 'নেশার' নেশা চিরতরে বিদায় না নেওয়া অবধি ওকে বন্দি হয়েই থাকতে হবে।... অন্তত যতদিন কিশোর সিংহ এখানে আছে! ■

বাঁকুড়ায় শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

বীরভূম জেলার স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা তাদের ১১১ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তকে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে বাঁকুড়া শহরের পাঞ্চজন্য ভবনে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ওঙ্কারধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রদ্ধার অনুভবী শ্রীমতী

বনানী চৌধুরী। শ্রীদত্তের পা ধুইয়ে তাঁর আরতি করেন শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তী। অর্ঘ্যস্বরূপ তাঁকে পরিধেয় বস্ত্র, ফল, মিষ্টান্ন ও মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। শ্রীদত্তের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেন বাঁকুড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অবনীভূষণ মণ্ডল, ড.তিলক রঞ্জন বেরা ও ড. বিজয় আঢ্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিউড়ি বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

এদিনই দুপুরে 'শ্রদ্ধা' তাদের ১১২ তম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বাঁকুড়া জেলার আঁধারথোল গ্রামের প্রবীণা মা শ্রীমত্যা লক্ষ্মীবালা মণ্ডলকে। উল্লেখ্য এই প্রবীণা মা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক জয়রাম মণ্ডলের মাতৃদেবী। তাঁরই প্রেরণায় শ্রীমণ্ডল সঙ্ঘের প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মণ্ডল পরিবারের দূরদূরান্তের আত্মীয়স্বজন সহ গ্রামবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ড. তিলক রঞ্জন বেরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী বনানী চৌধুরী। শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মায়ের পা ধুইয়ে আরতি করেন পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিরা। অর্ঘ্যস্বরূপ মাকে পরিধেয় বস্ত্র, শ্রীগীতা, ফল, মিষ্টান্ন ও মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। দেশ-জাতি-সমাজ সংগঠনে মণ্ডল পরিবারের ভূমিকার কথা বর্ণনা করেন প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা আঁধারথোল গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের জনপ্রিয় পূর্বতন শিক্ষক অবনীভূষণ মণ্ডল, স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা ড. তিলকরঞ্জন বেরা, বুদ্ধদেব মণ্ডল প্রমুখ। সঙ্ঘকাজে মায়ের প্রেরণার বিয়য়ে স্মৃতিচারণ করেন প্রচারকপুত্র জয়রাম মণ্ডল। গ্রামের কীর্তনীয়া প্রকাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে তাঁর দল কীর্তন পরিবেশন করে।

গ্রামবাসীরা মায়ের চরণ বন্দনা করে প্রণাম করেন। মণ্ডল পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে একটি করে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম পুস্তক প্রদান করা হয়। এমন ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে গ্রামবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বীরভূম বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়র শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। অনুষ্ঠান শেষে মণ্ডল পরিবারে পক্ষ থেকে ২০০ জনকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়ন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এদিন সারা গ্রামে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ক্রীড়াভারতীর কৃতী সংবর্ধনা ও পাঠ্যসামগ্রী বিতরণ

ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি করা সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ দিতে ক্রীড়া ভারতী হাওড়া জেলা সমিতির উদ্যোগে সাঁকরাইল ধুলাগড় সাঙ্কেডাঙা কালী মন্দিরে কৃতী সংবর্ধনা ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান ও কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তলনে রৌপ্য পদক জয়ী কৌস্তুভ ঘোষ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কৌশিক প্রামাণিক, সমাজসেবী সনাতন মহাতো, ধুলাগড়ী আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্য সামগ্রী তুলে দেন ক্রীড়া ভারতীর কার্যকর্তারা।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার বেহালা শরৎ সদন প্রেক্ষাগৃহে ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ পূর্তি এবং বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি শ্রীমতী সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় এবং গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ ডাঃ উচ্ছল কুমার ভদ্র ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জম্মু-কাশ্মীরে পুলওয়ামায় বীরগতি প্রাপ্ত জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। স্বাগত ভাষণে পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার বিশ্বাস পাঠচক্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, ১৯৬৭ সালে ভগিনী নিবেদিতা জন্মশতবর্ষেই পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এরপর রাজ্যপাল মহোদয় পাঠচক্রের স্মারক পত্রিকা 'মাভৈ'-এর উন্মোচন করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত বছরের পাঠচক্রের এবং ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত করেন। মাননীয়া বিচারপতি ও পূজ্যপাদ স্বামীজী তাঁদের সুললিত বক্তব্যে ভারতবর্ষের জাগরণে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন। রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর ভাষণে বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের হাত দিয়ে বেহালার পর্ণশ্রীর প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অশোক ঘোষ এবং সত্যেন রায় রোডের পশুপ্রেমী শ্রীমতী সুমতি নায়েককে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠনের দ্বিতীয়ার্ধে পাঠচক্রের পাঁচজন সদস্যকে সম্মানিত করা হয়। নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে তিরিশটি বিদ্যালয় ও দুটি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে তিরিশ জনের হাতে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। এরপর 'ভারতপ্রাণা নিবেদিতা' গীতি আলেখ্য এবং সন্ধ্যায় 'আমি নিবেদিতা বলছি' নাটক পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুজাতা ঘোষ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে মালদহে সামূহিক বিবাহ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মপ্রসার বিভাগের উদ্যোগে মালদা জেলার গাজোল ব্লকের মাঝরা অঞ্চলের বামনগ্রামে গত ৫ মার্চ শিব চতুর্দশীর পুণ্যলগ্নে এক সামূহিক বিবাহের আয়োজন করা হয়। এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে বনবাসী সমাজের ২১ টি দম্পতি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য, এর মধ্যে ৬ টি দম্পতি আগেই ঘর-সংসার বেঁধে সন্তানের পিতা-মাতা হয়েছেন এবং ১৫ জোড়া যুবক-যুবতী প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সেদিন সকালে বনবাসী মায়েদের কলস যাত্রা এবং দুপুরে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। পাত্র-পাত্রীদের হাতে বিবাহের আইনি প্রমাণপত্র সহ নানা রকম উপহার তুলে দেওয়া হয়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মপ্রসার বিভাগের সম্পাদক অচ্যুতানন্দ কর। সাঁওতালি ভাষায় বক্তব্য রাখেন গঙ্গপ্রসাদ মুর্মু ও গণেশ সরেন। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের ধর্মপ্রসার বিভাগ প্রমুখ মন্টু সরকার, মালদা জেলা সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় সহ বহু কার্যকর্তা। অনুষ্ঠানে দু'হাজারের বেশি মানুষের সমাগম হয়। সকলেই পঙ্‌ক্তি ভোজনে অংশগ্রহণ করেন। সবাই নবদম্পতিদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর

গত ৩ মার্চ কলকাতার প্রখ্যাত সামাজিক-সাহিত্যিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় এবং ফ্রেন্ডস অব কলকাতার উদ্যোগে স্থানীয় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়। আসরে কবি কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর বহুমুখী কবিতায় শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দেন। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাঁর কবিতায় বলেন,' মেরা পরিচয় মেঁ ক্যা বলুঁ/ মোটি পুস্তক ক্যেয়সে, কিতনে পন্নে খোঁলুঁ'। তাঁর 'জব জুর্ম ভী ইন্তেহা হোগী তো বগাওয়ত হোগী' পাঠ শুনে সভাগৃহ দেশভক্তির তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের ভূতপূর্ব বিচারপতি তথা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গিরিধর মালব্য বলেন, কেশরীনাথজীর ব্যক্তিত্বে ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। তিনি একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ,জনপ্রিয় রাজনেতা এবং সংবেদনশীল কবিরূপে দেশ-বিদেশে সম্মানিত। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিল্পপতি সজ্জন কুমার ভজনকা বলেন, রাজ্যপাল ত্রিপাঠী কলকাতার সমস্ত সামাজিক সংস্থাকে প্রেরণা দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার বুদ্ধিনাথ মিশ্র ত্রিপাঠীজীর কাব্য সমগ্রের পরিচয় প্রদান করেন। স্বয়ং কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন, 'কলকাতার সাহিত্যপ্রেমী মানুষ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। এই বঙ্গভূমিতে বসে আমি হিন্দি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ও উর্দু কবিতাও রচনা করেছি। বাংলাভাষায় আমার কিছু কবিতার অনুবাদও হয়েছে। এই প্রথম কলকাতায় এরকম আসরে কবিতা পাঠ করছি।' অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজেন্দ্র খণ্ডেলওয়াল।

দ্বারহাট্টায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার দ্বারহাট্টায় ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য সরস্বতী শিশু মন্দিরে বিশিষ্ট সমাজসেবী, শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন বিভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজের ১১৩ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৬ তম রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সরস্বতী শিশুমন্দিরের নিজস্ব ভবনে তাঁর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও মাল্যদানের মাধ্যমে শিবিরের শুভ সূচনা হয়। কলকাতার লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় ৪ জন মহিলা সহ ৪৬ জন রক্তদান করেন। পরে রাজবলহাট কালচারাল সোসাইটির সহযোগিতায় ২৯ জনের ব্লাড সুগার, ২৬ জনের ইসিজি এবং ১৭ জনের ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা করা হয়। ডাঃ জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ জনের নিউরোথেরাপি চিকিৎসা এবং ডাঃ নিমাই দাস ১৯ জনের চর্মরোগ পরীক্ষা করেন।

ঝাড়খণ্ডে 'শ্রদ্ধা'র শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ৩ মার্চ বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরের স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা ১১৩ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামতারা জেলার সটকি গ্রামের ৯১ বছর বয়সের শ্রীমত্যা ছবি দাসকে। ওঙ্কারধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি ধীরেন্দ্রনাথ দাস। শ্রদ্ধার অনুভবী শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে শ্রীমত্যা দাসের পা ধুইয়ে তাঁর আরতি করেন তাঁর বড়ো বৌমা শ্রীমতী মমতা দাস। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। মাল্যদান করে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায় । মায়ের সম্পর্কে অনুভব বর্ণনা কনে তাঁর পুত্র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস। শ্রদ্ধার পক্ষে উ পস্থিত ছিলেন সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু, অনুভবী সচ্চিদানন্দ দত্ত, বিশ্বনাথ দে, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে দাস পরিবারের পক্ষ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

সময়ের আহ্বানে ধর্মযোদ্ধা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

প্রীতীশ তালুকদার

নিমাই পণ্ডিত আজ যেন অন্যরকম, রোষানলে টগবগ করে ফুটছেন। চাঁদকাজি অপরাধ করেছে, তাঁর হরিনামের দলের উপর আক্রমণ করেছে, নবদ্বীপ নগরে কৃষ্ণনাম নিষিদ্ধ করেছে। তাই নিমাই পণ্ডিত আজ চলেছেন কাজিকে শাস্তি দিতে। দুঃসাহস বলে দুঃসাহস! কাজি নবাব-নিযুক্ত বিচারক, শাস্তিদাতা, সেই সঙ্গে কাজি নবাব হুসেন শাহের ভাগ্নে। একজন সনাতনী হয়ে সেই মুসলমান কাজির বিরুদ্ধে অভিযান! যথাসময়ে নবদ্বীপের পথে মশাল জ্বলে উঠল। মৃদঙ্গ-করতালের সঙ্গে হরিনাম যোগে বৈষ্ণবদের অগ্রবর্তী হয়ে নিমাই চলেছেন কাজি দমনে। চাপা উত্তেজনায় ফুটতে থাকা নগরবাসীর দরজা খুলে গেল। কী হয় এবার? নিমাই সদলবলে এগিয়ে চলেছে কাজির বাড়ির উদ্দেশে। পিছনে ভেঙে পড়েছে কৌতূহলী নগর। কেউ নিমাইয়ের জন্য আতঙ্কিত। নিমাই কেমন জব্দ হয় তা দেখে চোখ সার্থক করতে চায় কেউ। কারো কাছে এটা নিছকই বিনোদন। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে তারাও নিমাইয়ের দলের পিছু পিছু, হাতে প্রদীপ, লণ্ঠন বা মশাল। কেউ লক্ষ্য করেনি, কতিপয় বৈষ্ণবের সে যাত্রা অজান্তেই কখন কৌতূহলী জনতার মিশ্রণে জনজোয়ারে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্য করল একজন, কাজি স্বয়ং। খবরটা তার কাছে আগে থেকেই ছিল, নিমাইয়ের লোকবল বা হাতে গোনা গুটিকয় শাগরেদের খবরও তার ভালোই জানা ছিল। লেঠেল আর পাইকদের নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। কিন্তু এবার প্রমাদ গুনল, এ কী করে সম্ভব? লেঠেল, পাইকরা আগেই যে যেদিকে পারে পালিয়েছে, কাজিও সোজা বেগম মহলে আত্মগোপন করল। চতুর নিমাই বাড়াবাড়ি করলেন না, অবনত কাজিকে ক্ষমা করে যা হাসিল করার ছিল তা করে ফিরে এলেন। কাজ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল; আগ্রাসী ইসলাম এবার থেকে কিছুটা সংযত হলো। গুটিয়ে যাওয়া সনাতনীরা অনেকটাই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। আর নেতা রূপে নিমাইয়ের প্রতিষ্ঠা হলো।

ড. এস কে দে তাঁর 'বৈষ্ণব ফেথ্ অ্যান্ড মুভমেন্ট' গ্রন্থে বলেছেন— ''চৈতন্যচরিত্রে দেবত্ব ও অলৌকিকত্ব ধীরে ধীরে আরোপিত হওয়ায় তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি, বিদ্যা, চতুরতা, উপযুক্ত লোক সংগ্রহের ক্ষমতা, প্রতিভা ও গুণাবলী আলোচিত না হয়ে হারিয়ে গেছে।'' এভাবে আমরা মহাপ্রভুকে দেখতে অভ্যস্ত নই। আমাদের কাছে তিনি শুধুই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ এক ভক্ত বা স্বয়ং কৃষ্ণাবতার। প্রকৃতই কি তাই, নাকি এসব কিছুর পিছনে আছে সুচারু পরিকল্পনা?

মানুষ শুধু মায়ের কোলেই জন্মগ্রহণ করে না, একটা বিশেষ সময়ের কোলেও জন্ম নেয়। মায়ের যেমন স্বপ্ন থাকে, এই সন্তান একদিন তার সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান করবে, কর্ম দ্বারা দেশ ও দশের মঙ্গল করে পিতা-মাতার নাম উজ্জ্বল করবে, তেমন প্রত্যেক সন্তানের প্রতি চাহিদা থাকে সময়েরও। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে কি সময়ের আহ্বান পৌঁছেছিল? তিনি কি শুধুই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ এক ভক্ত বা স্বয়ং কৃষ্ণ? হরে কৃষ্ণ নামে কি পাপীতাপী উদ্ধার হয়? আমাদের চারপাশের কৃষ্ণভজনা-মুখরদের সঙ্গে অন্যদের কর্ম, চরিত্র, আচরণে কি বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়? তাদের দেখে কি মনে হয় তারা সকলে কলুষমুক্ত, স্বর্গের অধিকারী? তা যদি না হয় তবে পাপীতাপী উদ্ধারার্থে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, তাঁর সন্ন্যাস ও কর্মের সার্থকতা কোথায়? তবে কি আরও বেশি কিছু?

সময়টা তখন পনেরশো শতকের শেষ দিক। তৎকালীন নবদ্বীপ প্রাচ্যের বারাণসী, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনক্ষেত্র। এখানে এসে টোল খুলেছেন শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য। সংসারে আবদ্ধ হবার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না আচার্যের, কিন্তু ঘটনাচক্রে তা হয়ে ওঠেনি। তা হোক, সংসারে থেকেও তিনি সন্ন্যাসী। একাদশ শতকের শুরুতেই মধ্য এশিয়া থেকে যে ধর্মীয় আগ্রাসন আছড়ে পড়ল ভারতের পশ্চিম প্রান্তে তার সঙ্গে সনাতন ভারতের কোনও পরিচয় ছিল না, ছিল না সে ধর্মের রূপের সঙ্গে পরিচয়। এক হাতে কোরান, অন্য হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে একের পর এক সাগরের-ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে থাকল হানাদাররা। ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবেশী রাজ্য মগধের পতন হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধদের রক্তে ভেসে গেছে মগধ, ওদন্তপুরের মাটি। গৌড়ের বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের মনে ভয়টা ঢুকেছিল, কিন্তু উপবীত প্রলম্বিত টিকি-তিলক চর্চিত পণ্ডিত ও সভাসদগণ আশ্বাস দিয়েছে— ওই মূর্খ যবনের

কী সাহস, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। তাই গীতগোবিন্দের রসাস্বাদন আর কৌলিন্য প্রথার চর্চা করে বেশ কাটছিল। অতর্কিত আক্রমণে বিনা যুদ্ধে নবদ্বীপ হলো যবন বক্তিয়ার খলজির বশীভূত। বক্তিয়ার অবশ্য বাংলায় গেড়ে বসেনি, ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই রুকনুদ্দিন কাইকাউসের অধীনতা দিয়ে বাংলায় ইসলামি শাসন তথা নির্যাতনের পাকাপাকি সূচনা। শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ, ইলিয়াস শাহ হয়ে এখন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। পার হয়ে গেছে প্রায় তিনশোটা বছর। এই তিনশো বছরে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এসেছে অনেক পরিবর্তন; নিজ ভূমে হিন্দু আতঙ্কগ্রস্ত, রক্তাক্ত, ক্ষয়িষ্ণু। এক দিকে ইসলামি শাসকের দ্বারা বিধর্মী সনাতনীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বিবিধ কর, অত্যাচার, ছলে-বলে-কৌশলে ইসলামিকরণ, ধর্মে আঘাত, নারী অপহরণ, ধর্ষণ। অপর দিকে উদ্‌ভ্রান্ত সনাতনীদের অতি রক্ষণাত্মক হতে গিয়ে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা আর বিধি-বিধানের নাগপাশে জড়িয়ে পড়া, যা পক্ষান্তরে আগ্রাসী ইসলামেরই সহায়ক হয়ে ওঠে।

পার্শ্ববর্তী পিরুল্যার সনাতনীরা অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে। তারাই মুসলমান হয়ে এখন সনাতনীদের ভয়ানক শত্রু হয়ে উঠেছে। সকল অবহেলা অত্যাচারের প্রতিশোধ চায় এখন। শিমুলিয়াও তাই। মহেশ্বর বিশারদ কাশীধামে পালিয়েছে। তার ছেলে বাসুদেব পালিয়েছে ওড়িশা। আরও অনেকে অনেক দিকে। নবাব এখানে কাজি বসিয়েছে, কাটোয়ায় মুলুকপতি। তাদের মাধ্যমে চলছে সনাতনীদের উ পর অত্যাচার; ছলে, বলে, কৌশলে সনাতনীদের ধর্ম নাশ করে মুসলমান করা চলছে। বর্ণহিন্দু আর সমাজপতিদের অত্যাচারে জর্জরিত সনাতনীরা সহজেই পড়ে যাচ্ছে কাজির খপ্পরে। তাদেরই বা কী দোষ, কেউ পাশে দাঁড়ানোর নেই। বর্ণহিন্দু আর সমাজপতিরা তাদের করে রেখেছে অস্পৃশ্য। ধর্ম ও দেবতার আরাধনায় তাদের অধিকার নেই, আছে শুধু বিধিনিষেধের নাগপাশ ও তার উলঙ্ঘনে শাস্তি। মানুষের মর্যাদাটুকুও তাদের নেই।

কীভাবে ধর্ম রক্ষা হবে, কীভাবে রক্ষা হবে সনাতনীদের। উত্তেজিত হয়ে লাফিয়ে চিৎকার করে ওঠেন প্রবীণ অদ্বৈত আচার্য। পাঠান মুসলমানের বেটাকে সনাতন ধর্মে দীক্ষিত করে টোলে স্থান দিয়েছেন, ফুলিয়ায় আশ্রম করে দিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচারে নিযুক্ত করেছেন। হরিসভার আসরও বসিয়েছেন। কিন্তু এতে হবে না। এমন কাউকে চাই যে ধর্মের অভ্যন্তরের আত্মঘাতী বিধিনিষেধ, অস্পৃশ্যতা আর ভেদাভেদের বেড়াজাল ভেঙে সাম্যের অধিকার দিয়ে সকলকে একই সনাতন ধর্মের গৌরবে গৌরবান্বিত করে এক ঐক্যবদ্ধ সনাতন জাতির জাগরণ ঘটাতে পারবে। পথে, ঘাটে, পাঠশালায় তার চোখ সর্বদা খুঁজে ফেরে এক দৈবী মুখ, যাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, করা যায় সে মহাযজ্ঞের ঋত্বিক, মহাযুদ্ধের সেনাপতি।

জগন্নাথ মিশ্রের ছোট ছেলে নিমাই অল্প বয়সেই পণ্ডিত রূপে নাম করেছে। গৌর বর্ণ, বিশাল শরীর, চওড়া বক্ষপট, টিকোলো নাক, টানা-টানা উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মুখে পান দিয়ে ধুতির কোচা দুলিয়ে সমবয়সি ছাত্রদের নিয়ে যখন বাজারে ঘোরে তখন চোখ ফেরানো যায় না। সংসারী হয়ে শচীমাতাকে আশ্বস্ত করেছে। বিনি পয়সায় কলাটা, মুলোটা হাতিয়ে নেয় দোকানিদের কাছ থেকে। পিতৃসমরা আপশোস করে বলাবলি করেন, সংসারের হালটা ধরেছে ঠিকই কিন্তু বামুনের ছেলে হয়েও ধর্মে মতি হলো না নিমাইটার। পথেঘাটে হঠাৎ দেখা হলে কেউ যদি উপদেশ দিতে আসে সপাটে উত্তর আসে— 'সোঽহম্', আমিই সেই পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, কে কার পূজা করবে!

বেশ চলছিল। হঠাৎই একদিন নবদ্বীপ নগরে অদ্বৈত আচার্যের আঙিনায় এক দিব্য সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হলো। ধর্মময় ভারতবর্ষে সাধুসন্ন্যাসীর অভাব নেই। নবদ্বীপের মতো ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থানে যে তাঁদের আনাগোনা লেগে থাকে তা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সন্ন্যাসীর আগমন স্বাভাবিক মনে হয় না। মাসাধিক কাল থাকলেন, তন্ন তন্ন করে নবদ্বীপের আনাচে কানাচে ঘুরলেন, তার পর একদিন বিদায় নিলেন। কেউ জানল না তাঁর প্রকৃত পরিচয়, জানলেন শুধু অদ্বৈত আচার্য আর যুবক নিমাই পণ্ডিত। ইনি শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরী। গোপন কিছু পরামর্শও হলো অদ্বৈত আচার্য আর নিমাইয়ের সঙ্গে। একটা আমন্ত্রণও পেলেন নিমাই— 'গয়ায় এসো'।

তখন থেকে কিছু অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল নিমাই পণ্ডিতের আচরণে। তিনি শিষ্য-বন্ধুদের নিয়ে প্রায়ই অস্পৃশ্য গোয়ালা, তাঁতি, ধোবা, চাষা, মুচি, ডোম পল্লীতে যেতে লাগলেন। রুখে দাঁড়ালেন তাদের উপর হওয়া নির্যাতনের বিরুদ্ধে। তাদের বাড়িতে খাওয়া, গল্প করা শুরু করলেন। আর হরিনামের সভায় যোগদানও শুরু হলো। কতটা স্বর্গীয় পিতৃদেবের জন্য পিণ্ডদানার্থে, কতটা ঈশ্বর পুরীর আমন্ত্রণে বলা শক্ত, নিমাই এবার গেলেন গয়া— যেখানে সেই ঈশ্বর পুরী আছেন। পিতৃদেব ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান শেষে নিমাই ঈশ্বর পুরীর কাছে কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হয়ে নবদ্বীপে ফিরলেন। গয়া থেকে ফেরার পর ভাবোন্মত্ততা চেপে ধরল নিমাইকে। শিক্ষকতার পাট উঠে গেল। সর্বদা কৃষ্ণনামে পাগল হয়ে উঠলেন তার্কিক নিমাই পণ্ডিত। নবদ্বীপের পথে অবতীর্ণ হলেন কলির প্রেমাবতার। ধর্ম ও বর্ণের উঁচু-নীচু ভেদ রেখা মিশে গেল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চওড়া বক্ষপটে।

বাল্যে এক সন্ন্যাসীর হাত ধরে ঘরছাড়া বীরভূমের হানাই পণ্ডিতের ছেলেটা এখন যুবক। নবদ্বীপের নিমাইয়ের চেয়ে বয়সে একটু বড়, দেখলে মনে হবে দু-ভাই। গুরু গত হয়েছেন, নিত্যানন্দ এখন একা সুদূর দক্ষিণ ভারতের শ্রীরঙ্গমে। হঠাৎই এক বার্তা এল; কেউ একজন অপেক্ষা করছেন তার জন্য, উত্তর ভারতের বৃন্দাবনে। কে ইনি? তাঁকে কীভাবেই বা চিনলেন? কীই বা প্রয়োজন তাঁকে! হাজারো বিস্ময় আর প্রশ্ন মাথায় নিয়ে দূর পথ অতিক্রম করে নিত্যানন্দ এসে পৌঁছলেন বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতে, যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেই শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী অদ্বৈত আচার্য ও ঈশ্বর পুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী। উদগ্রীব নিত্যানন্দকে অন্য এক মন্ত্রে দিক্ষিত করলেন মাধবেন্দ্র পুরী। ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে ভেসে যাওয়াই শুধু সন্ন্যাসীর কাজ নয়। বাংলার নবদ্বীপে তোমার জন্য কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা করছে।

নিত্যানন্দ এসে যোগ দিলেন নিমাইয়ের সঙ্গে। ডাক পেয়ে ফুলিয়া থেকে এসে যোগ দিয়েছেন হরিদাস। নিত্যানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর এবং আরও অনেকে; নিমাইয়ের দল গড়ে উঠল। শুরু হলো কৃষ্ণনামের মাধ্যমে সনাতন সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে জাগরণ ঘটানোর কাজ। কিন্তু সহজ নয় সে পথ। মুসলমান শাসকের বাধা তো আছেই, আছে উন্মার্গগামী বৌদ্ধ পাষণ্ডী ও তান্ত্রিকরা। সবচেয়ে বড় বাধা যেন সনাতন ধর্মের এই সমাজটার ভিতরেই। তাই এমন কিছু চাই, এমন পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে তুলতে হবে যাতে মানুষ আর অস্বীকার করতে না পারে। ডাকও এসেছে। আরও বড় ক্ষেত্রে জাগিয়ে তুলতে হবে সনাতন জাতিকে। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের ৭ মাঘ ভোরবেলা শচীমাতা ও সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পিছনে ফেলে সন্ন্যাসের পথে পা বাড়ালেন নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছেন আর এক শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী কেশব ভারতী। ■

সমাজ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মান্ধতা, ভেদবুদ্ধি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় ভারতবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেব এসে যদিও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন তবুও পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদ, সৌরতন্ত্র, হীনযান, মহাযান, বজ্রযানাদি প্রভৃতি কূট নিয়মে মানব সমাজে কল্যাণের পথ আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যায়। তৎপরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদাদি প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা ছিল এইসব বিষয় থেকে বহু দূরে। আর শূদ্র জাতীয় সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। তাদের জীবন ছিল ভারবাহী পশুর মতো, গলায় ঘণ্টা বেঁধে তাদের পথ চলতে হতো। ওই সময় সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হলে উচ্চ শ্রেণীর নিষ্পেষণে শূদ্র জাতীয় সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে হাঁপিয়ে উঠলো। অনন্তর তুর্কির আক্রমণে জাতীয় জীবন বিপর্যস্ত হলো, আর মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস হতে লাগলো। জনজীবন ভীষণভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। বিদেশিদের আক্রমণে ভারতবাসীর জীবনে বিপর্যয় নেমে এলো। ভয়ে, লোভে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। সমাজের এই প্রকার দুরবস্থা দর্শন করে শান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সনাতন বৈদিক সমাজকে সংকটময় পরিস্থিতি হতে রক্ষা করার জন্য তুলসী-গঙ্গাজলে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হলে ১৪০৭ শকের (১৪৮৬ খ্রি:) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন। সুমহান ব্যক্তিত্বের জনক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ এক তাৎপর্যমণ্ডিত যুগান্তকারী ঘটনা।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের দিনে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সহস্র সূর্যের মতো দশদিক আলোয় উদ্ভাসিত করে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে সমাজ জীবনে ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন এক মহান বিপ্লবী সমাজ- সংস্কারক। সমাজের ভয়ানক দুঃসময়ে তিনি মানব জাতির কল্যাণের জন্য কলির যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ- শ্রেণী নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবোধে উদ্দীপিত করে বৈদিক সাম্যবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ সংস্কারের উজ্জ্বল বিজয় পতাকা তিনি ঊর্ধ্বে উড্ডীন করেন। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ভেদ নেই। চণ্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ণ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হরিভক্তি পরায়ণ যবন হরিদাসকে তিনি আচার্যত্ব দান করলেন। খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধর হতে গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র পর্যন্ত, মহাপাপী জগাই-মাধাই হতে রাজমন্ত্রী রূপ-সনাতন পর্যন্ত আপামর মানুষকে তিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে একত্রিত করে মানবতার স্বাভাবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনেন। ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ- চণ্ডাল-ম্লেচ্ছ, উচ্চ-নীচ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তিনি মানবতার এক আসনে বসবার সুযোগ দান করলেন শ্রীহরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে। অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, কলুষিত মূঢ় ম্লান সমাজকে প্রেম, স্নেহ-ভালোবাসার মন্ত্র দিয়ে তিনি ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্মকে রক্ষা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন— জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও কলহে শতধা বিভক্ত কলুষিত সমাজের মধ্যে একটা স্থায়ী কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে হলে নতুন দৃষ্টিতে ধর্ম সংস্থাপন করতে হবে। আর সেই দৃষ্টি হলো স্নেহ-প্রেম ও অহিংসার দৃষ্টি। তিনি সর্বপ্রথম অহিংসার পথে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্তন করেন। তৎকালে নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজী আদেশ জারি করেছিলেন— নগরে বা গৃহে কেউ হরিনাম সংকীর্তন করলে সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সদলে হুংকার দিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে চাঁদকাজীর অঙ্গনে গিয়ে উচ্চস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবমণ্ডিত ও গম্ভীর মুখমণ্ডল, অহিংসা প্রেমের নির্ঝর, অপার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দর্শন মাত্রেই চাঁদকাজী মুগ্ধ, অভিভূত এবং ভীত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করার জন্য ঢালাও অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর বললেন— আমার বংশে কেউ যদি হরিনাম সংকীর্তনে বাধা দেয় আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সুকোমল প্রেমিক হৃদয় হলেও জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মসংযম ও ত্যাগ বৈরাগ্যের দ্বারা সংসার বন্ধন ছিন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সংযম, তিতিক্ষা, সৌন্দর্য, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অনন্য সুলভ পাণ্ডিত্য প্রকর্ষ, স্বভাব সুলভ কোমল বাক্যালাপ, বিনয় গর্ভ অমায়িক ব্যবহার ইত্যাদি দিব্যগুণাবলী সকল জাতীয় লোকের চিত্তাকর্ষক ছিল। এ জন্যই তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। আজকের দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসে আমরা সকলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। তিনি আমাদের সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

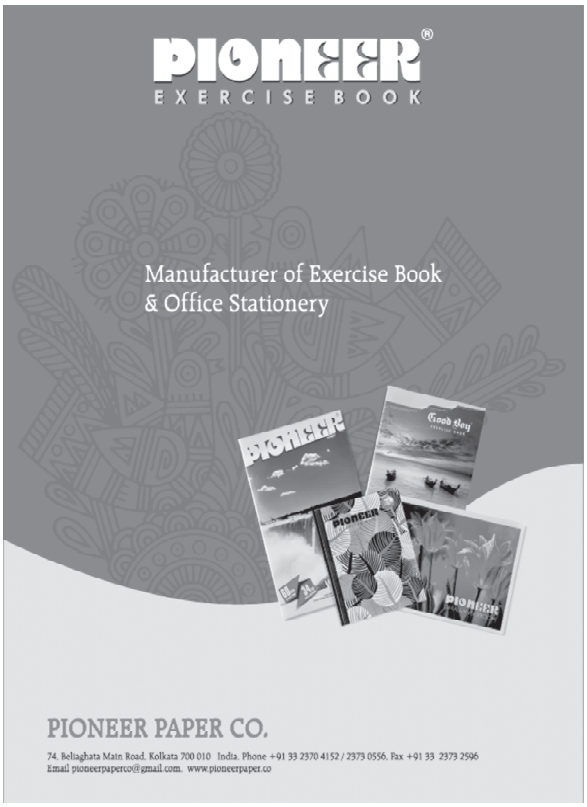

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

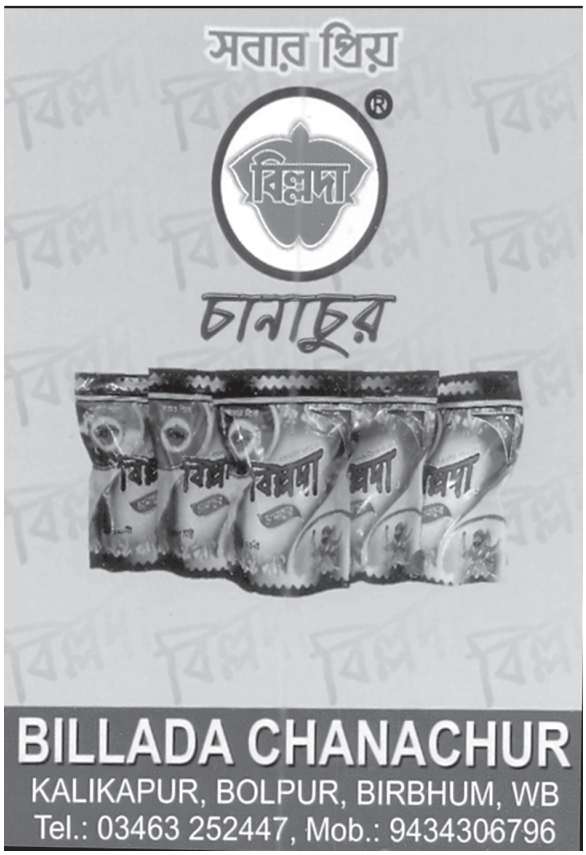

বব্বা ও ধনেশপাখি

শেখর সেনগুপ্ত

বব্বাকে সবাই চেনে। আলো হাওয়া রোদ্দুর— পরিবেশ ঝকঝকে থাকলে বব্বা ঘরোয়া আবেষ্টনীতে থাকবার বান্দা নয়। থপথপিয়ে ভুঁড়ি নাচিয়ে টলতে টলতে চলেছে ছোকরা। বারেকের তরে তেলেভাজার দোকানটার সামনে দাঁড়ালেও দাঁড়াতে পারে। পকেটে যদি খুচরোও কিছু থাকে, একটা চপ অন্তত কিনে খাবে। ভালোভাবে ভদ্রভাবে যারা তেজগঞ্জে থাকে, তারা বব্বাকে দিয়ে দু-পাঁচ টাকার বিনিময়ে টুকটাক কাজ করিয়ে নেয়। অর্থাৎ বব্বা ভিখিরি নয়, পকেটমারও নয়, তাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কোনওদিন ঝুট-ঝামেলা, কলহ পাকেনি। হয়তো এ কারণেই পাড়ার সিন্ডিকেটীয় দাদারা ওকে অপছন্দ করে, অবান্তর কটুক্তিও করে। তবে বব্বার মায়ের দেহজ বিভঙ্গগুলি তাদের বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও অনুভূতিতে অন্য এক মাত্রা আনে এবং সেই কারণেই বব্বার অন্তত নিরাপত্তা নিয়ে ভয় নেই।

বব্বার একটা ছোটো দোষ— সে সামান্য তোতলা। সাধারণত তোতলাদের মধ্যে ক্রোধ সহজেই ঘনীভূত হলেও বব্বাকে আজ অবধি কেউ ক্রোধে ফেটে পড়তে দেখেনি। সে কথা বলে কম। দু'চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। মনের গহনে বুঝি প্রোথিত সন্দেহ। সন্দেহের কারণকে অপসারিত করতেও সে বদ্ধপরিকর। এ কারণে আবেগ যদিও বা আসে, অচিরে কর্পূরের মতো উবেও যায়। এই মুহূর্তে সে কোথায় কী কম্মো করতে যাচ্ছে, সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে বলে মনে হয় না। ওই দেখুন, এলাকার একমাত্র টলটলে জলাশয়ে তার চলমান শরীরের ছায়াটা কেমন উঠছে নামছে। তেলের অভাবে একমাথা চুল ধূসর। সারা দেহে প্রচুর গত্তি। বয়স মেরেকেটে সতেরো থেকে ঊনিশ। মিনিট দশেক আগে সরকার বাড়ির রাঁধুনি তার মা তিনখানা বাসি রুটি গিলিয়েছে কুমড়োর ছক্কা সহযোগে। মা খুব কুশলী। কালেভদ্রে দু-এক টুকরো মাছও সরায়। বব্বার ভীষণ অপছন্দ এ ধরনের উদরপূর্তিতে । তবে উপায় নাস্তি।

এ হেন বব্বাকে আপনি যদি ওর বাপের কথা জিজ্ঞেস করেন, সে মুহূর্তে উদাস। আস্তে আস্তে মাথা নাড়াবে। হাতড়ে মেলা স্মৃতি বড়ো রক্তাক্ত। বাবার

একখানা ছবিও দেয়ালে নেই। লোকটা ভ্যানরিক্সা টানত। ছেলের বয়স যখন সাত, ভ্যান সমেত তাকে পিষে দিয়ে যায় একটা দশ চাকার ট্রাক। বিচিত্র ব্যাপার হলো, ওই ঘাতক ট্রাকের যিনি মালিক, সেই সরকারবাবুর বাড়িতেই রাঁধুনিগিরি করছে বব্বার মা। বব্বা ভুলেও তার বাপের প্রসঙ্গ টানে না। কেউ এ নিয়ে খোঁচালেও তার মুখে খিল্। যে তোর বাপকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে, তারই হেঁসেলে ঢুকে রান্না করছে তোর মা! এ কথার পরও বব্বার মুখে কাতরোক্তি নেই। হয়তো তন্ন তন্ন করে খুঁজলে দেখা যাবে, কঠিন একটা শপথ তার নিজস্ব প্রেতপুরীতে দিনে দিনে মাসে মাসে বছর গড়ালেও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। গত মাসে আলমগঞ্জের কাঠকলের মালিক, ক্ষমতাসীন দলের কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন বব্বাকে নিয়োগ করেছিলেন মাত্র দু'দিনের জন্য কিছু গোপন চিঠিপত্তর এদিক-ওদিক পৌঁছে দেবার কাজে। সেই কাজ করতে গিয়েই বব্বার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে আভাস দিয়েছে, আর কিছুদিনের মধ্যে পার্টির একটা ভয়ংকর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হতে চলেছে। নাসিরুদ্দিনের কেবল কাঠচেরা নয়, জুঁই ফুলের মতো লতিয়ে বাড়ছে মাদকের চোরাকারবারও। বব্বার দৃষ্টি সজাগ। কিন্তু মুখ খুলে বিপদ বাড়াবে না।

তার বেঁচে থাকাটাই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এই একটা সময়, যখন সাধারণের রাগ বা অভিমানের কোনও দাম নেই। নিশ্চিন্তির ভান করে যেতে হবে। নাসিরুদ্দিন হজে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর ম্যানেজার আব্বাস এক রাতে কাটকলের চোরকুঠরিতে খাপসুরত একজোড়া পরিকে আনিয়েছিলেন। বব্বা সাক্ষী। জীবনে সেই প্রথম তার শরীর আনচান করছিল। আব্বাসের হুঁশিয়ারি, '...কোহি কুছ পুঁছে তো ভি মুহ্ মত্ খুল না। নহি তো তেরা জবান খিচ্ লুঙ্গা।...'

বব্বা এখন চলেছে দামোদরের চরভূমি সদরঘাটের দিকে। আজ ওখানে মেলা বসেছে। মেলার নাম 'জীবন মেলা'।

পশুপাখির হাট। মাসে একবার বসে। গোরু-মোষ থেকে শুরু করে রকমারি কুকুরছানা ও পাখিদের বেচা-কেনা। আগে ভিড় যথেষ্ট হতো। এখন সেই সে; শোরগোল কমে এসেছে। বব্বার পকেটে কিন্তু মাত্র একখানা দশ টাকার নোট। তা নিয়েই তার ঘুর ঘুর শেষ হলো এক পাখিওয়ালার সামনে গিয়ে। মোট দুটি খাঁচায় ঠাসা তার পশরা। পাখিওয়ালাকে দেখে বব্বা চমকে উঠলেও নিশ্চুপ থাকে। পাখির দামে পিলে চমকাবে। একটা ছোটো টিয়ার দাম আড়াই শ'! যে খাঁচাটা সবার পিছনে, তাতে একটা আজব পাখি— ধনেশ! ধনেশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বব্বা। কপালে ভাঁজ পড়ে। হলুদ ঠোঁট, মস্ত দু' পায়ের নখগুলি যেন তলোয়ার। দুই চোখ লাল। কিন্তু অমন নিশ্চল কেন? ধনেশ যতই স্বভাবগম্ভীর পাখি হোক, নড়াচড়া তো করবে। এ যে একেবারে পাথর। অত বড়ো ধারালো হলুদ ঠোঁট। সে এক-আধ বার নিজের জড়োয়ার নেকলেসের মতো ঝিলিকমারা ডানায় খোঁচাখুচি করবে না? বব্বার পর্যবেক্ষণ নিবিড়তর হয়। সে দূরত্ব কমিয়ে আনে। গোধূলির শেষ রশ্মিও নির্বাপিত প্রায়। খদ্দেরদের ভিড় ইপ্সিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি তখনও। আকাশের বুকে একটি দুটি করে তারা ফুটে উঠছে। এতক্ষণ দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করবার পর বিক্রেতারা এবার সত্যি আকুল। আর ঠিক তখনই—

তখনই মেলাপ্রাঙ্গণে চকিত চাঞ্চল্য। হন্তদন্ত হয়ে হুটার বাজাতে বাজাতে মেলাতে ঢুকে পড়েছে একগাড়ি পুলিশ। পৃথক জিপে পুলিশের একদল আমলাও। মেলায় যতটুকু প্রত্যাশা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল, সব লোপাট। পুলিশ মানেই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কে একজন দড়ি ও কোদাল হাতে মেলার দিকে আসছিল। পুলিশের নজরে আসতেই কৃষকসেতুর পানে দিল ছুট। পুলিশের ব্যাটারিচালিত চোঙায় ধ্বনিত হচ্ছে হুঁশিয়ারি, '...খবর আছে, এই মেলাতেই বিক্রেতার ভেক ধরে এক মাদক ব্যবসায়ী রয়েছে। আমরা তাকে ধরব। কেউ পালাবার চেষ্টা করে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না...'

চলল প্রচুর টানাহ্যাঁচড়া। রেজাল্ট নিল। দাপট দেখাচ্ছিলেন যে উর্দিধারী আধিকারিক, তিনি এখন ঘর্মাক্ত। জলের দুটো বোতল খালি করে ফেললেন। বব্বা গুটিগুটি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

'স্যার।'

'তুই কে?'

'আমি বব্বা গুঁই। তেজগঞ্জে বাড়ি।'

'কী বলতে চাস?'

'ওই পাখিটার দিকে তাকান।'

'কোন পাখি?'

'ওই যে ধনেশ পাখিটা। নড়ে না, চড়ে না। আসলে ওটা জ্যান্ত নয়।'

'কী বলতে চাইছিস?'

'ওর পেটে খোঁচা মারুন। কিছু পেলেও তো পেতে পারেন।'

দারোগা দাপিয়ে এগিয়ে চলেছেন নিথর ধনেশ পাখির দিকে। আর বব্বা ফিরে যাচ্ছে অন্য পথ ধরে। তার মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ। অনেকদিন বাদে একটা কাজের মতো কাজ করতে পারবার আনন্দে তার থলথলে বপুতেও গতি ক্রমেই বাড়ছে। ■

চতুর্থ তরাইনের যুদ্ধ

সন্দীপ চক্রবর্তী

বীরেনের মনে হলো এ হতেই পারে না। এরকম একটা অবান্তর আবদার সে যদি মেনে নেয় তাহলে একটা মারাত্মক বিপদ নেমে আসবে। স্বয়ং ঈশ্বরও তাদের বাঁচাতে পারবেন না।

রাজা বলল, 'বাবা তুমি আলতাফদার কথা ভাবছো তো? ভয় নেই, আমি ওর সঙ্গে কথা বলব।'

বীরেন ছেলেকে একবার দেখল। রাজা আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। সতেরো বছর বয়েস। গালে চাপ দাড়ি আর দু'দিক সরু করে ছাঁটা গোঁফে বেশ ভারিক্কি লাগে রাজাকে। আজকাল লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-একটা সিগারেটও খায়। কিন্তু বুদ্ধিটা এখনও কাঁচা। বীরেন ছেলেকে কাঁচা কাজ করতে দিতে পারে না। তাই বলল, 'তোকে কারোও সঙ্গে কথা বলতে হবে না।' তারপর মেয়ের দিকে ফিরল বীরেন। রানি বাবার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল। অবান্তর আবদারটি তারই। গতকাল বিজয়া দশমী গেছে। রানির খুব ইচ্ছে এবার বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হোক। বীরেন বলল, 'বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করা যাবে না রানি। তুই তো জানিস সেদিন আলতাফ কী বলে গেল!'

সুলতা এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার বলল, 'আলতাফ বলেছে শাঁখ বাজানো যাবে না। তাতে ওদের নাকি অসুবিধে হয়। কিন্তু পুজো করতে তো বারণ করেনি।'

'তুমি জানো না সুলতা, শাঁখ বাজাতে বারণ করা একটা ছুঁতো। ওরা আসলে চায় না আমরা পুজো-টুজো করি।'

সুলতা মানল না। বলল, 'আলতাফ অন্তত একথা বলেনি। এসব তোমার কল্পনা।'

বীরেন অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য! নবিগঞ্জ অ্যাথলেটিক ক্লাবের দুর্গাপুজো যারা বন্ধ করেছে তাদের সর্দার ছিল ওই আলতাফ। তুমি সব ভুলে গেলে নাকি?'

সুলতা কিছুই ভোলেনি। সে গ্রামের মেয়ে। ছোটোবেলা থেকে বারব্রত পুজোআর্চা করে বড়ো হয়েছে। বহরমপুরে বীরেনদের পৈতৃক বাড়িতে যতদিন ছিল আবাল্যের অভ্যেসে কোনও ছেদ পড়েনি। কাল হয়েছে এই নবিগঞ্জে এসে। তাও প্রথম প্রথম সব ঠিকঠাকই চলছিল। মাসখানেক আগে আলতাফ এসে সেই যে হুমকি দিয়ে গেল তারপর থেকে সব বন্ধ। বীরেনের খুব ভয়। আলতাফ নাকি খুবই কমিউনাল স্বভাবের ছেলে। হিন্দু মেয়েদের সর্বনাশ করার জন্য ওরা মুখিয়ে থাকে। রানি স্কুল থেকে একা ফেরে। সেই সময় যদি ওরা দল বেঁধে এসে রানিকে...সুলতা নিজেকে শক্ত করল। সবাই মিলে ভেঙে পড়লে এখানে থাকা

যাবে না। হেসে বলল, 'মিছিমিছি চিন্তা করো না। আমি আলতাফের মায়ের বয়েসি। দরকারে আমি ওকে অনুরোধ করব। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বীরেন কিছু বলল না। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এর বেশি দেরি হলে কপালে দুঃখ আছে। নতুন হেড মাস্টারমশাই অম্বরীশবাবু কড়া প্রকৃতির লোক। পাঁচ মিনিট দেরি হলেও লেট মার্ক লাগিয়ে দেন। দশ বছর পর রিটায়ারমেন্ট। এই বয়েসে ঝুটঝামেলা আর ভালো লাগে না।

লম্বা প্যাসেজের শেষপ্রান্তে সিঁড়ি। এই ফ্ল্যাটবাড়িতে মোট ন'টা ফ্ল্যাট। বাসিন্দাদের মধ্যে বীরেনরাই শুধু হিন্দু। বাকিরা মুসলমান। অবশ্য গোটা নবিগঞ্জেই মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি। হিন্দুরা সংখ্যালঘু। নিজভূমে পরবাসীর মতো তাদের থাকতে হয়। তবে কতদিন থাকতে পারবে সন্দেহ আছে। বীরেন শুনেছে অনেকেই মুসলমান প্রমোটরদের চাপে বাড়িঘর জলের দামে বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

মেন গেট দিয়ে বেরোবার সময় মোবারক হোসেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটাকে পছন্দ করে না বীরেন। দেখা হলেই হালাল করা মাংসের কত গুণ তার বর্ণনা দেয়। এসব কথা শুনলে বীরেন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কিন্তু কিছু করারও নেই। হাজার হোক প্রতিবেশী। তার ওপর এরই ছেলে আলতাফ। বীরেন একগাল হেসে বলল, 'সালাম আলেইকুম মোবারক ভাই। খবর সব ভালো তো?'

মোবারক সালাম করে বলল, 'আল্লার দুয়া। —তা, আপনি বেরোচ্ছেন বুঝি?'

'আর কী করব বলুন! কলুর বলদ ঘানি তো টানতেই হবে।'

মোবারকের পোলট্রির ব্যবসা। নিজেকে কলুর বলদের সঙ্গে তুলনা করে মোবারককে একটু তোয়াজই করল বীরেন। এটা যে সে ভেবেচিন্তে করে, তা নয়। হয়ে যায়। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে বলেই হয়তো সে স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারে না।

মোবারক খুশি হয়ে বলল, 'আপনাকে কত করে বলি একদিন বাড়িতে আসুন। হালাল করা কচি পাঁঠার বিরিয়ানি খেয়ে যান। আপনি তো আসেনই না।

'যাব একদিন।'

বীরেন একরকম পালিয়েই গেল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। টোটোয় উঠে ব্যাগ থেকে বোতল বের করে জল খেল। হালাল করার কথা উঠলেই বীরেনের ছোটোবেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। একবার বাবার সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে সে পাঁঠা হালাল করা দেখেছিল। বাড়ি ফিরে সারাদিন কিছু খেতে পারেনি। বারবার বমি হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন নার্ভাস ব্রেকডাউন। তারপর থেকে মাংস দেখলেই বমি পেত। অনেক বছর লেগেছিল স্বাভাবিক হতে।

।। ২।।

নবিগঞ্জ থেকে বাঁকিপুর মাত্র তিনটে স্টেশন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের আরও কাছে। কিন্তু বাঁকিপুর নবিগঞ্জের থেকে আলাদা। এখানে হিন্দুরা সংখ্যায় কম হলেও তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। প্রত্যেক শনিবার জগত্তারিণী মন্দিরে ধুমধাম করে পুজো হয়। কাঁসর ঘণ্টা বাজে। আজ অবধি কেউ আপত্তি করেনি। তবে বীরেন খুব একটা ভরসা পায় না। জনবিন্যাস একবার বদলাতে শুরু করলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে বীরেন রিকশা নিল। হাতে খানিকটা সময় আছে। টোটোয় গেলে বীরেনের স্কুল নলিনীকান্ত স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিনিট পাঁচেক লাগে। রিকশায় ওটা বড়জোর পনেরো মিনিট হবে।

স্টেশন বাজার এলাকা পেরিয়ে যাবার পর শুরু হলো আদিগন্ত ধানখেত। সময়টা আশ্বিনের মাঝামাঝি। গরম তত নেই। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর মন জুড়িয়ে যায়। কিন্তু বীরেনের মনে সুখ নেই। মাথায় হাজারো ভাবনা। এদেশে মুসলমানদের থাকার ব্যাপারে হিন্দুরা কোনওদিন বাধা দেয়নি। অথচ আজ মুসলমানরা হিন্দুদের তাদের স্বভূমি থেকে উৎখাত করতে চায়। সত্যিই যদি সেরকম দিন আসে বাঙ্গালি হিন্দুরা কোথায় যাবে? কে তাদের আশ্রয় দেবে?

স্কুলে পৌঁছে যাবার পরও ভাবনাটা বীরেনকে ছাড়ল না। সেভেন বি সেকশনে শাজাহানের ইতিহাস পড়াতে পড়াতে ভুলে করে জাহাঙ্গিরের কথা বলে ফেলল। তারপর ভুল বুঝতে পেরে বলল, 'সরি! জাহাঙ্গির নয় শাজাহান ইংরেজদের কুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।'

টিফিনের সময় সুশোভন বীরেনের পাশে এসে বসল। দু'জনে একই দিনে চাকরিতে জয়েন করেছিল। সম্পর্কটা সহকর্মীর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বন্ধুর পর্যায়ে চলে গেছে। বীরেন সুশোভনকে বিশ্বাস করে। সুশোভনের বুদ্ধিবিবেচনার ওপর ওর অগাধ আস্থা। বীরেন আগে থাকতেই ভেবে রেখেছিল সুলতার লক্ষ্মীপুজো করার ইচ্ছের ব্যাপারে সুশোভনের সঙ্গে পরামর্শ করবে। সুশোভন অবিবেচক নয়। এত বড়ো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ও পুজো করার পরামর্শ দেবে না।

সুশোভন বলল, 'সুলতা তো অন্যায় কিছু বলছে না বীরেন। আমরা সবাই যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাই তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি হিন্দু বাঙ্গালির একদিন কী হাল হবে ভেবে দেখেছিস?'

বীরেন ভুলে গেল কিছুক্ষণ আগে সেও হিন্দু বাঙ্গালিদের ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিল। বিস্ফারিত চোখে বলল, 'কী বলছিস তুই! ভয় পাব না? শাঁখের শব্দ কানে গেলে ওরা আমার মেয়েটার সর্বনাশ করে দেবে।'

'বেশ তো, শাঁখ বাজাবি না।'

'তা হলেও ওরা জানতে পারবে। ধূপের গন্ধ আছে, আরতির সময় ঘণ্টার শব্দ আছে। না না সুশোভন, এ হয় না।'

সুশোভন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'হয় বীরেন। ইউপিতে হয়, বিহারে হয়, শুধু এই পশ্চিমবঙ্গে হয় না। কেন হয় না জানিস? আমরা সব লড়াই ড্রইংরুমে বসে লড়ি বলে।'

'রাগ করলি! আসলে আমার খুব ভয় করছে।'

'তোর সামনে তিনটে রাস্তা খোলা আছে। বহরমপুরের এসপি আমার পরিচিত। চাইলে কথা বলতে পারিস। বাঁকিপুরের এমএলএ সতীশবাবুর সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। ওর সঙ্গে কথা বলা

যায়।'

পুলিশের কাছে যাওয়ার কথায় বীরেন মনে মনে শিউরে উঠল। সতীশবাবু শাসকদলের এমএলএ। ভোটের জন্য ওরা মুসলমানদের তোয়াজ করেন। আলতাফের নামে অভিযোগ করলে বীরেনের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বীরেন শ্বাস গোপন করে বলল, 'আর তিন নম্বর রাস্তা?'

সুশোভন হেসে বলল, 'আলতাফ যেমনটা চাইছে তেমনটাই করা।'

টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। সুশোভন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার ক্লাস আছে। যেতে হবে। শুধু একটা কথা বলে যাই। ছেলেমেয়ের কথা চিন্তা করে আজ যদি পিছিয়ে আসিসও, ওদের কিন্তু বাঁচাতে পারবি না। তোর কাপুরুষতার দাম একদিন ওদেরই দিতে হবে।'

বীরেন একাই বসে রইল। এই পিরিওডে তার ক্লাস নেই। থাকলেও সে নিতে পারত না। কয়েকটা ফালতু কথা বলে সুশোভন সব ঘেঁটে দিয়ে গেছে। কী দরকার ছিল এসব কথা বলার! বীরেন বিবাহিত। তার ঘরসংসার আছে। নিজের সন্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে দেশোদ্ধার করা কি তার সাজে? সুশোভন বিয়ে করেনি। কোনও পিছুটান নেই। সন্তানস্নেহ কাকে বলে ওর পক্ষে বোঝা সম্ভবই নয়।

মনস্থির করে ফেলল বীরেন। পুজো হবে না। দরকারে বীরেন আবার বোঝাবে সুলতাকে। বারবার বোঝাবে। একান্তই না বুঝলে সবাইকে নিয়ে বহরমপুরে চলে যাবে। ওখানে লক্ষ্মীপুজো হয়। মা দাদা বউদির সঙ্গে সুলতাও পুজো করবে।

বাড়ি ফিরেই বীরেন কাজে লেগে পড়ল। নানা যুক্তি সাজিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল আলতাফ শাসিয়ে যাবার পর বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো করাটা কতখানি বিপজ্জনক।

কিন্তু এবারও সুলতাকে রাজি করানো গেল না। গ্রামের মেয়ে হলেও তার মন যথেষ্ট শক্ত ধাঁচের। ছেলে-মেয়েকে সে অসম্ভব ভালোবাসে, কিন্তু ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সে কেমন করে বেঁচে থাকবে সেটা অন্য কেউ ঠিক করে দিক, সুলতা চায় না। তাই বিরক্ত হয়ে বলল, 'একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি এমন জলঘোলা করছ কেন বলো তো? তোমাকে তো সকালেই বললাম, আলতাফ শুধু শাঁখ বাজাতে বারণ করেছে পুজো করতে নয়। আর যদি ক্লাবের পুজোর কথা বলো, তাহলে বলব ক্লাবের পুজো গোপনে করা যায় না। তাই আলতাফরা বাঁদরামি করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আমরা এমনভাবে পুজো করব আলতাফ তো দূর কাকপক্ষীও টের পাবে না।'

বীরেন বলল, 'ঠাকুর কিনব, পুজোর অন্যান্য জিনিসপত্র কিনব, বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ এসে পুজো করবেন— আর কেউ জানতে পারবে না। বললেই হলো?'

'তোমায় কিছুই করতে হবে না। যা করার রাজা করবে। আমি ওকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি।'

'কী বুঝিয়ে দিয়েছ!'

'সময় হলেই জানতে পারবে।'

সুলতা রান্নাঘরে চলে যাবার পর বীরেনের মনে পড়ল, বহরমপুর যাওয়ার কথাটা বলা হয়নি। কিন্তু সুলতাকে ডাকতে গিয়েও বীরেন ডাকল না। ডাকতে পারল না। বার বার একই কথা বললে সুলতা রেগে যেতে পারে। সুলতার রাগকে সমঝে চলে বীরেন। ঝগড়াঝাটির ধারেকাছেও যায় না সুলতা। স্রেফ কথা বন্ধ করে দেয়। তখন সেই পাহাড়প্রমাণ নৈঃশব্দ্য পেরিয়ে সুলতার কাছে পৌঁছনো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

তার চেয়ে এখন থাক।

কিন্তু থাকেই বা কী করে! রাতে বীরেন কথাটা তুলল, 'তোমার যখন লক্ষ্মীপুজো করার এত ইচ্ছে তখন চলো আমরা সবাই মিলে বহরমপুরে চলে যাই।'

বহরমপুরের প্রসঙ্গ যে আসবে সুলতা অনুমান করেছিল। তাই অবাক হলো না। বীরেনকে সে খুব ভালো চেনে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেই বীরেন পালাতে চায়। নানা অজুহাত দিয়ে নিজের আত্মবিশ্বাসের অভাব ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। এমনিতে মানুষটা ভালো, কিন্তু কোনও প্রিন্সিপাল নেই। বিয়ের পর প্রথম প্রথম সুলতা হাঁপিয়ে উঠত। একজন শিক্ষিত মানুষ কীভাবে এত ছোটো গণ্ডীর মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে? ইদানীং সুলতার মনে হয় পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রে না ফেললে বীরেন কোনওদিন লড়াই করতে শিখবে না। আর ক্ষুধার্ত হাঙরদের মুখে বীরেনকে ছুঁড়ে ফেলার অপ্রিয় কাজটা করতে হবে সুলতাকেই।

'কী হলো কথা বলছ না যে!' বীরেন জিজ্ঞাসা করল।

সুলতা বলল, 'বহরমপুরে আমি যাব। তবে এ বছর নয়।'

'ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়েও কি তুমি জিদ ছাড়তে পারো না সুলতা?'

'ছেলেমেয়েকে এর মধ্যে টানছ কেন? ভয় তো পেয়েছ তুমি!'

বীরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ পেয়েছি। সেইজন্যেই তো বলছি পুজো করার দরকার নেই। ফালতু ঝুটঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী!'

'পুজোটা আমার কাছে উপলক্ষ্য। আমি আমার মতো করে একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাই।'

'তাতে লাভ?'

সুলতা হেসে বলল, 'আমি অন্তত জানব কোনও দ্বিচারিতা করিনি। নিজের বিশ্বাসের কাছে আগাগোড়া সৎ থাকতে পেরেছি।'

বীরেন আর কিছু বলল না। সিলিংয়ের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। হালকা হলুদ আলোয় ভেসে রয়েছে ঘরটা। বীরেন অন্ধকারে ঘুমোতে পারে না বলে ঘরে নাইট বালবের ব্যবস্থা। কিন্তু আজ আলোটাই তার শত্রু হয়ে উঠেছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে হচ্ছে আড়াল থেকে কে যেন তাকে দেখছে।

আলোটা নিভিয়ে দিল বীরেন। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কিন্তু আজ অস্বস্তির লেশমাত্র নেই। আশ্চর্য! শুয়ে পড়ল বীরেন। এবং ঘুমিয়েও পড়ল।

।। ৩ ।।

আলতাফ এল পরেরদিন সকালে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়েস। লম্বা দোহারা গড়ন। আগে প্যান্টশার্ট পরত। এখন বেশিরভাগ সময় পাঠানদের মতো পোশাক পরে। মাথায় পাগড়ি বাঁধে।

ন'টা বেজে গেছে। বীরেন বেরনোর

প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে আলতাফকে দেখে অবাক হলো, 'তুমি! এত সকালে কী মনে করে?'

আলতাফ আজ চোখে সুর্মা দিয়েছে। সিগারেট আর পানের দাগ ধরা দাঁত বের করে হেসে বলল, 'একটা খবর দিতে এলাম চাচা।'

'কী খবর?'

'পরশু তো আপনাদের লক্ষ্মীপুজো। ওইদিন মসজিদে বিশেষ নমাজ হবে। তাই বড়ো মৌলবি সাহেব বলে দিয়েছেন, হিন্দুরা যেন পুজো-টুজো না করে। ওতে ইসলামের তওহিন হয়।'

বীরেনের মনে হলো অনেকগুলো হলুদ আলো দপদপ করে তার চারপাশে জ্বলে উঠছে। সবাই তাকে দেখছে। হাসছে সবাই। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল বীরেনের। নিজের মনে গুমরে সবার রাগ নয়, ফেটে পড়ার রাগ। কিন্তু আলতাফের চোখের দিকে তাকিয়ে বীরেন গুটিয়ে গেল।

সুলতা বলল, 'খবর বলছ কেন আলতাফ? বলো ফতোয়া।,'

আলতাফ হেসে বলল, 'সে আপনি যা ভালো বোঝেন চাচি। আমি শুধু বলব পুজো-ফুজো করবেন না। পরে আবার আমি আসব।'

হিন্দি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আলতাফ চলে গেল।

সুলতা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। আলতাফ যে পুজো বন্ধ করার ফতোয়া দেবে একথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। বড়ো মৌলবির নাম করে আলতাফ মিথ্যে কথা বলছে বলে সুলতার ধারণা। কিন্তু এই নবিগঞ্জে বাস করে সত্যিমিথ্যের বিচার করবে কে? অসহায় বোধ করল সুলতা। সে জীবনে কোনওদিন মুসলমানদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। তাদের চাঁচলের বাড়িতে দু'জন মুসলমান কাজ করেন। গফুরকাকা আর আমিনাপিসি। বাড়িতে বিশেষ কোনও খাবার তৈরি হলে আগে ডাক পড়ে গফুর আর আমিনার। সুলতা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছে। সেই উদার পৃথিবী থেকে সুলতা আজ কোন নরকে নির্বাসিত হলো?

রাজা রানির মুখেও কথা নেই। সুলতা বীরেনের দিকে তাকাল। বীরেন তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে রাখছিল। অবাক হলো সুলতা। আজ বীরেনের চোখেমুখে ভয়ের কোনও চিহ্ন নেই। আশ্চর্যরকমের শান্ত আর নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে মানুষটা। এও কি সম্ভব? চেনা বীরেনকে ফিরিয়ে আনার জন্য সুলতা বলল, 'তুমি কিছু ভেবো না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব।'

বীরেন একথার কোনও উত্তরই দিল না। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি বেরোচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

আজ স্কুলে পরপর ক্লাস। দম ফেলবার সময় নেই বীরেনের। ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বীরেন নিজের মনকে বোঝার চেষ্টা করছিল। সে কি সুলতার ওপর অভিমান করেছে? সে জানত আলতাফদের আসল উদ্দেশ্য হিন্দুদের ধর্মাচরণের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত বীরেনের ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুলতার বিশ্বাস জেতেনি। কিন্তু না। এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি বীরেনের মন। বরং প্রশ্ন করেছে, তুমি কি সুলতার বিশ্বাসকে এত ছোটো মনে করো? যদি করো তা হলে তুমি মূর্খ। সুলতার বিশ্বাস অনেক বড়ো। হারজিতের নিরিখে তা বিচার করা যায় না।

টিফিনের পর ক্লাস ইলেভেনের ঘরে ঢুকল বীরেন। এ বছর থেকে স্কুলে আর্টস সেকশন চালু হয়েছে।

বীরেনের মন আজ তার বশে নেই। পৃথ্বীরাজ চৌহানের ইতিহাস পড়াতে পড়াতে যত রাজ্যের অবান্তর স্মৃতি তার মাথায় ভিড় জমাচ্ছে। মনে পড়ছে প্রদীপ সেনের কথা। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। একবার পৃথ্বীরাজ চৌহানের ইতিহাস পড়িয়ে একটা প্রশ্ন করেছিলেন। বীরেনের মনে হলো সেই প্রশ্ন তার ছাত্রদেরও করা যায়। দেখাই যাক না, সেদিন বীরেন যে উত্তর দিয়েছিল এরা কেউ দিতে পারে কি না!

পড়ানো শেষ করে বীরেন বলল, 'পৃথ্বীরাজ কী ভুল করেছিলেন তোমরা কেউ বলতে পারো?'

ক্লাসে মাত্র পাঁচজন হিন্দু ছাত্র। বাকি সবাই মুসলমান। প্রথমে কেউ কিছু বলল না। বীরেন যখন ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবছে তখন উঠে দাঁড়াল বিমল দাস নামের এক ছাত্র, 'স্যার আমার মনে হয়, প্রথম তরাইনের যুদ্ধে জেতার পর পৃথ্বীরাজ চৌহানের উচিত ছিল ওখানেই ঘোরিকে মেরে দেওয়া।'

শাবাস! মনে মনে বলল বীরেন। কিন্তু ওর আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ইসমাইল, পরভেজ আর সালাউদ্দিন তেড়ে গেল বিমলের দিকে। ইসমাইল বলল, 'হিন্দুরা আবার মুসলমানদের কী মারবে রে! তোরা তো আমাদের দেখলেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাস।'

বীরেন যা জানতে চেয়েছিল জানা হয়ে গেছে। বিবদমান দুটি দলের মাঝখানে গিয়ে সে বলল, 'এখানে হিন্দু মুসলমানের কথা উঠছে কেন ইসমাইল? কথা তো হচ্ছে দু'জন যোদ্ধাকে নিয়ে।'

'পৃথ্বীরাজ তো হিন্দু ছিল স্যার। আর ঘোরি মুসলমান।'

'তাতে কী হলো? দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘোরি যা করেছিল সেটাই যদি পৃথ্বীরাজ প্রথম যুদ্ধে করতেন তাহলে কি ঘোরি আবার ফিরে আসতে পারত?'

ইসমাইল কিছু বলল না। বিমলের মুখে বিজয়ীর হাসি দেখে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল বীরেন।

।। ৪ ।।

বাঁকিপুরের এম এল এ সতীশ সামন্তের কাছে যেতে চায়নি বীরেন। বিমল দাসের কালকের সেই হাসিমাখা মুখটা এখনও তার মনের মধ্যে ভেসে আছে। ফাঁক পেলেই বীরেন মনের ভেতরটা তোলপাড় করে ফেলেছে। আসলে বিমলকে দেখার অজুহাতে সে খুঁজতে চাইছে পুরনো বীরেনকে। সে বীরেন একদিন পৃথ্বীরাজ চৌহানের ভুল ধরে ফেলেছিল।

তবুও সুশোভন যখন বলল, 'চল না একবার আর কিছু হোক বা না হোক, একজন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় তো হবে',— বীরেন আপত্তি করেনি। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করা ছাড়া আর

একটা স্বার্থ বীরেনের আছে। পুরনো বীরেনকে সে তো হারিয়েই ফেলেছিল। কোনও স্মৃতিই অবশিষ্ট ছিল না। গত কয়েকদিনে সুলতা সুশোভন আলতাফ ইসমাইল বিমল— সেই লুপ্ত স্মৃতির অনেকখানি ফিরিয়ে দিয়েছেন। হয়তো সতীশ সামন্ত আরও খানিকটা ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

সতীশ সামন্ত সুশোভনের ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির তরফের আত্মীয়। সুশোভনের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ ভালোই। বীরেনের সমস্যার কথা শুনে বললেন, 'নবিগঞ্জের ওসিকে আমি ফোন করে দেব। তবে একটা কথা—' সতীশ সামন্ত সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'পুলিশ প্রোটেকশন দেবে ঠিকই কিন্তু আপনাদেরও সাহস দেখাতে হবে। নয়তো সমাধান হবে ওপর ওপর।'

টোটোয় উঠে সুশোভন বলল, 'এখনই ডিসিশন নেবার দরকার নেই। বাড়ি যা। সুলতার সঙ্গে আলোচনা কর।'

বীরেন অন্য কিছু ভাবছিল। তার মনের পরতে পরতে জড়িয়ে ছিল এক সুন্দর প্রতিমা। ভারতবর্ষের প্রতিমা। এদেশে আশ্রয় চেয়ে কেউ কখনও ফিরে যায়নি। সেই আশ্রয় কারা দিয়েছিল? হিন্দুরা। হ্যাঁ, হিন্দুরা। বাবার কথা মনে পড়ল বীরেনের। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় বহরুমপুরের নামকরা উকিল ছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, কিন্তু বিজয়া দশমীতে আগে মুসলমান মক্কেলদের বাড়িতে যেতেন। ছেলেকে বলতেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্ কথাটার মানে জানিস বীরু? সারা পৃথিবীর মানুষ আমার আত্মীয়।' বীরেন অস্ফুটে বলল, 'আলতাফকে আমি আত্মীয় বলে ভাবতে পারি বাবা। কিন্তু ওর কাছে আমি কাফের। মালাউন! সব নষ্ট হয়ে গেছে বাবা। সব।'

সাড়ে ছ'টার ট্রেন আসতে এখনও মিনিট দশেক দেরি। সুশোভন বলল, 'আজ তোর কী হয়েছে বীরেন! এত অন্যমনস্ক লাগছে কেন?'

সংবিৎ ফিরল বীরেনের। হেলে বলল, 'কিছু না। অনেকদিন পর বাবার কথা মনে পড়ল।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ছোটো ছোটো ঘটনা অনেক সময় বড়ো জীবনের সন্ধান দিয়ে যায়।'

ট্রেন এসে গেল। যাত্রীদের ওঠানামার কোলাহলে চাপা পড়ে গেল সুশোভনের বিস্ময়।

পরেরদিন সমস্ত চরাচর জুড়ে সোনালি রং ঝরিয়ে সূর্য উঠল। আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। বীরেনের ছুটি। রাজা আর রানিরও ছুটি। শুধু সুলতার কাজের অন্ত নেই।

গতকাল স্কুল থেকে ফিরেই খবরটা পেয়েছিল বীরেন। সুলতা ছেলেকে দিয়ে সাহেবপুর থেকে ঠাকুর আর পুজোর জিনিসপত্র আনিয়েছে। কাকপক্ষীও টের পায়নি। চালের ব্যাগে এসেছেন মা লক্ষ্মী আর আটার ব্যাগে পুজোর জিনিসপত্র। রাজার অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনতে শুনতে বীরেনের রাগ হচ্ছিল। ফেটে পড়ার মতো রাগ। বীরেনের মনে হচ্ছিল স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিককে কেন এরকম উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে? কিন্তু না। সলিতায় লাগা আগুনকে বারুদ পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়নি বীরেন। দিতে পারেনি। কারণ তার আজন্মলালিত ভয় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাগের ওপর।

আজও বীরেন ভয় আর রাগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সে লক্ষ্য করেছে রাগটা হলে ভয় থাকে না। সারা পৃথিবীর শক্তি এসে জড়ো হয় তার মনে। যেন সে একাই ভারতবর্ষকে বদলে দিতে পারে। কিন্তু রানির কথা মনে হওয়া মাত্র সে আবার কোটরে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন বীরেন এমনই এক দোলাচলের মধ্যে কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যে হলো। এবারে পূর্ণিমা আটটা পর্যন্ত। তার মধ্যেই পুজো করতে হবে।

সুলতা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। পুজো করবে রাজা। তার জন্য ছেলেকে প্রশিক্ষণও দিয়েছে সুলতা।

গরদের ধুতি পরে পুজোয় বসল রাজা। রানিও আজ নতুন শাড়ি পরেছে। বীরেন অবাক হয়ে দেখছিল। তার ছোট্ট মেয়েটি বড়ো হয়ে গেছে সে টেরই পায়নি। খুশির ভাবটা কেটে গেল খুব দ্রুত। বুকের ভেতর খাঁ খাঁ শূন্যতা। আলতাফের হাত থেকে সে কি তার মেয়েকে বাঁচাতে পারবে? বীরেন তাকাল সুলতার দিকে। সুলতা গলায় আঁচল দিয়ে হাতজোড় করে বসে আছে। রানিও বিভোর। রাজার শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে গমগম করছে তাদের ফ্ল্যাট।

পুজো শেষ হলো এক সময়। বীরেন সভয়ে দেখল রানির হাতে শাঁখ। বীরেন বলতে চাইল, 'ওকে শাঁখ বাজাতে বারণ করো সুলতা।' —কিন্তু বলা হলো না। কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। শঙ্খধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে দূরদূরান্তে। সুলতার মুখে হাসি। রাজা তৃপ্ত। রানি সুখী।

আর বীরেন? শান্ত। ভাবলেশহীন।

কিছুক্ষণ পর কলিংবেল বাজল। সবাই জানে কে। দুর্গ আক্রান্ত হবার পর যোদ্ধারা যেরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দৃষ্টিতে একে অপরকে দেখে, ঠিক সেইভাবে সুলতা দেখল রাজাকে। রাজা রানিকে। সুলতা বলল, 'কেউ যাবে না। আমি যাব।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! বীরেন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সলিতায় দপদপ করছে আগুন। ফুলকি ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে বারুদের দিকে। বীরেন শুনতে পাচ্ছে সুলতার গলা, 'বাবাকে যেতে দিস না রাজা।' একবারও পিছন না ফিরে বীরেন দরজা খুলল।

আলতাফের সাজানো হাসি মুছে গেছে। চোখে সাক্ষাৎ শয়তানের দৃষ্টি। বীরেনকে দেখে বলল, 'এত করে বারণ করলাম তবুও পুজো করলেন! এরপর রানির ক্ষতি হলে আমরা কিন্তু দায়ী থাকব না।'

বোমাটা সশব্দে ফাটল। তার এতদিনের পুষে রাখা আতঙ্কের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বীরেন বলল, 'একটা রানিকে খরচ করলে যদি সারা দেশ জেগে ওঠে তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই আলতাফ।

আলতাফকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বীরেন দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর মেয়েকে বলল, 'কোনও ভয় নেই রানি। সতীশবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি কথা দিয়েছেন আমাদের সাহায্য করবেন।' ■

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ১৪।।

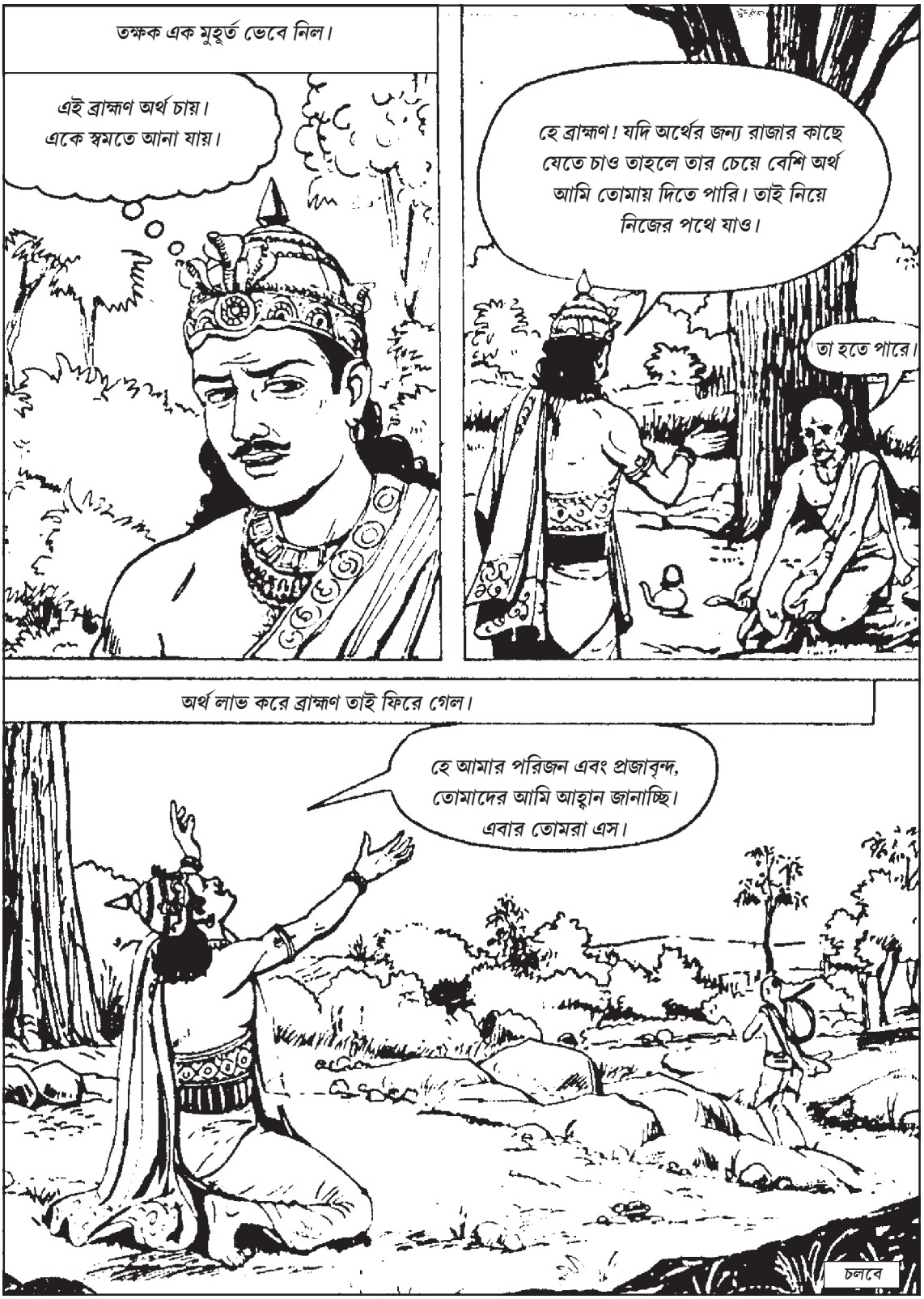

জন্মশতবর্ষের আলোকে
দত্তোপন্ত বাপুরাও ঠেংড়ী

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

হিন্দু ভাববাদী, চিন্তাশীল এবং ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দত্তোপন্থ বাপুরাও ঠেংড়ীর জন্ম ব্রিটিশ ভারতের মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলার আর্ভি গ্রামে ১০ নভেম্বর ১৯২০ সালে দীপাবলীর দিনে। তাঁর পিতা শ্রীবাপুরাও দাজীবা ঠেংড়ী এবং মাতা জানকী দেবী। খুব ছোটোবেলা থেকে তাঁর সাংগঠিক পরিচয় ফুটে উঠতে থাকে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে ডি আর্ভি-তে 'বানর সেনা' সংগঠনের সভাপতি এবং মিউনিসিপ্যাল উচ্চবিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের সভাপতি মনোনীত হন। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৬-৩৮ সালে তিনি হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হন। ১৯৫০-৫১ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। পোস্টাল অ্যান্ড রেলওয়ে ওয়াকার্স ইউনিয়নের কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী)- এর দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হন। শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি ছিলেন এমএ,এলএলবি। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কর্মজীবনে বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁকে 'ঠেংড়ীজী' কিংবা 'রাষ্ট্রঋষি'— এই সম্বোধনে ডাকা হতো।

তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতা এতটাই ছিল যে একাধিক জনপ্রিয় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ১৯৭৯ সালে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ, ১৯৯১ সালে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও সামাজিক সমরসতা মঞ্চ, সর্বপন্থ সমাদর মঞ্চ, পর্যাবরণ মঞ্চ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাতেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। এছাড়া তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ, অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত এবং ভারতীয় বিচার মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৬৪ থেকে ৭৬ সালে দু'দফায় তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন এবং ১৯৬৮-৭০ সালে তার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন। সাংসদ হিসাবে তিনি অতুলনীয় স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৫ সালে তিনি জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং নানান রাজনৈতিক প্রবাহকে এক ছাতার তলায় আনতে সমর্থ হন।

তিনি ছিলেন সতত ভ্রমণশীল ব্যক্তি। সাংগঠনিক কাজ করতে গিয়ে দেশের প্রায় সকল জেলা শহর এমনকী বহু তালুক ও গ্রাম ভ্রমণ করেন এবং তথায় নিবাস করেন। সাংসদ প্রতিনিধিরূপে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং হাঙ্গেরি (১৯৬৯) ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭৯ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক Anti-Apartheid Conference-এ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে আমন্ত্রিত হয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর উদার অর্থনীতির প্রভাব সংক্রান্ত অনুধ্যান করেন। অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি চীন, জাকার্তা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কেনিয়া, উগান্ডা ও তানজানিয়ায় ভ্রমণ করেন।

তিনি অসংখ্য পুস্তকের রচয়িতা। তাতে কেবল ভাবাদর্শ স্থান পেয়েছে তা নয়, তাতে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর অজস্র অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল অধ্যায়।

ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, পরিচিতি ও প্রচারে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। গ্রাম-সংসদকে সমৃদ্ধ করে সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখানোর তিনি অন্যতম কারিগর। তাঁরই যোগ্য নেতৃত্বে ও যোগ্য উত্তরসূরি নির্মাণের প্রেক্ষিতেই ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ আজ বিশ্বের সর্ববৃহৎ কৃষক সংগঠনের অবয়ব লাভ করেছে। সারা ভারতবর্ষের নানান প্রান্তের সঙ্গে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তও রাজ্যস্তর থেকে শুরু করে জেলা, ব্লকও গ্রামস্তরে ঠেংড়ীজীর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে ব্রতী হয়েছে। তার জন্য নানান পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে— প্রতিটি জেলা ও রাজ্যে একটি করে বৃহৎ ও মনোজ্ঞ আলোচনা সভায় বাংলা ভাষায় ঠেংড়ীজীর কর্ম ও জীবনদর্শন সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ; প্রতিটি জেলায় কৃতী বিশেষজ্ঞদের আহ্বান করে 'Dattopant Thengdi Memorial Lecture' প্রদান করে কৃষিজীবী মানুষদের আধুনিক প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত করা এবং রাজ্যের দু' একটি জেলায় ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের জেলা-করণের নাম ঠেংড়ীজীর নামে অভিহিতকরণ ইত্যাদি। গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত কিষান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের তরফে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীর স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

এ রাজ্যে বর্ষব্যাপী নানান কার্যক্রম রূপায়ণ করে তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হবে। ■

ফঃ ৬

ভক্তের মহিমা

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করে রাজচক্রবর্তী সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। সেই যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বড়ো বড়ো মুনি ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন। যজ্ঞ শেষে শুরু হয় দেশের

আপামর মানুষদের ভোজনের পালা। শ্রীকৃষ্ণ আগেই যুধিষ্ঠিকে বলে রেখেছিলেন মানুষজন খেয়ে-দেয়ে সন্তুষ্ট হলে মন্দিরের ঘণ্টা আপনা থেকেই বেজে উঠবে। তখনই বোঝা যাবে যে, রাজসূয় যজ্ঞ ত্রুটিবিহীন হয়েছে।

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের খাওয়া-দাওয়া চলল। এভাবে প্রায় একবছর চলল। কেউ বাদ গেল না। সবাই পাণ্ডবদের জয়গান করতে লাগল। রাজা যুধিষ্ঠির খবর নিয়ে জানলেন কেউ আর অভুক্ত নেই। তা সত্ত্বেও ঘণ্টা বাজল না কেন তাই তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাহলে কি রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ হয়নি? মাতা কুন্তী আর পাঁচভাই ম্লানমুখে শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ঘণ্টা যখন বাজেনি, তখন যজ্ঞতো পূর্ণ হয়নি। এখনো নিশ্চয় কেউ অভুক্ত আছে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে পাঠালেন কে অভুক্ত আছে তাকে খুঁজে আনতে। চারভাই খুঁজতে খুঁজতে নগরের এক প্রান্তে এক কুঁড়েঘরে দেখতে পেলেন এক মুচি একমনে জুতো সেলাই করে চলেছে। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল, শরীর লাবণ্যময়। মাথার চারপাশে থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। লোকের কাছে চারভাই শুনলেন তিনি কারো কাছে কিছু নেন না। জুতো সেলাই করার বদলে কেউ দয়া করে কিছু দিলে তাই নেন। জুতো সেলাই করেন আর সারাদিন ভগবানের নামগানে মগ্ন থাকেন।

চারভাই তাঁর কুটিরে হাজির হলেন। তাদের দেখে মুচি ভয় পেয়ে গেল। হাত জোড় করে বলল আমি অস্পৃশ্য। আমাকে ছোঁবেন না। চারভাই তাঁকে প্রণাম করে রাজসভায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। মুচি কিছুতেই রাজি হয় না। অবশেষে ভীম তাকে পাঁজাকোলা করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন।

যুধিষ্ঠির ও মাতা কুন্তী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে যত্ন করে বসিয়ে পা ধুইয়ে দিলেন। নতুন পোশাক দিলেন। পুরনারীরা শঙ্খ বাজালেন। হুলুধ্বনি করলেন। তারপর তাঁকে খেতে বসালেন। দ্রৌপদী মন দিয়ে রান্না করেছেন। তাঁর মতো রাঁধুনি সেযুগে কেউ ছিল না। নানা রকম পদ তিনি এই ভক্তের জন্য রেঁধেছেন। সোনার থালায় সোনার বাটিতে সেইসব পদ সাজিয়ে দিলেন।

মুচি এমন খাবার জীবনে দেখেনি। কীভাবে খেতে হয় তাও জানে না। দ্রৌপদী, মাতা কুন্তী আর চার ভাই সামনে বসেছিলেন। মুচি সমস্ত খাবার এক সঙ্গে মেখে খেতে শুরু করল। মুচি রান্নার মর্ম বুঝতে পারছে না দেখে দ্রৌপদীর মন বিরক্তিতে ভরে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, আমি এত ভালো করে রান্না করলাম আর এই মুচি তার মর্মই বুঝতে পারল না। কিন্তু মুচি তৃপ্তির সঙ্গে সব খেয়ে ফেলল। কিছুই বাদ দিল না।

মুচির খাওয়া শেষ হলো কিন্তু এবারও ঘণ্টা বাজল না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির খুবই দুঃখিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ সবই বুঝতে পেরেছেন। তিনি বললেন, এই মুচি খুব বড়ো ভক্ত। নিশ্চয় তোমাদের কারো মনে মুচির প্রতি অশ্রদ্ধা রয়েছে, তাই ঘণ্টা বাজল না। তোমরা ভক্তের অপমান করলে। তখন একে একে মাতা কুন্তী ও পাঁচভাই বললেন যে,তাদের মনে কোনো খারাপ ভাবের লেশমাত্র নেই। যদি খারাপ কিছু থাকে তবে এক্ষনি যেন তাদের মৃত্যু হয়। ভীম খুব রেগে গেলেন। তখন দ্রৌপদী স্বীকার করলেন মুচির খাওয়া দেখে তাঁর মনে অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের কথামতো দ্রৌপদী অনুতপ্ত হয়ে মুচির পা ধরে ক্ষমা চাইতেই ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ সবার দিকে চেয়ে বললেন ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা। এবার ধর্মরাজের রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ হলো।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের পথে পথে

নাগপুর

মহারাষ্ট্রের নাগ নদীর তীরে প্রাচীনকালের বিদর্ভদেশ আজ নাগপুর। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। দশম শতক থেকে বনবাসী গোণ্ড সমাজ রাজত্ব করে। পঞ্চদশ শতকে কিছুকালের জন্য মহম্মদ বাহমনির দখলে গেলেও আবার গোণ্ড রাজাদের অধিকারে আসে। ১৭৪০ সালে ভোঁসলে রাজাদের অধিকারে আসে। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশরা সেন্ট্রাল প্রভিন্সের রাজধানী করে নাগপুরকে। দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে শহরের মধ্যস্থলে বিশালাকার মহাদেব মূর্তি,ভোঁসলে রাজাদের সীতীবুল্ডি দুর্গ, শ্রীপাদেশ্বর রামমন্দির, আমবাজারি ঝিল, দীক্ষাভূমি, ফুতাল লেক, শহরের বাইরে তিলনকান্ডি ঝিল, মরকাণ্ডা মন্দির ইত্যাদি। শহরের কেন্দ্রস্থলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ারের সাধনভূমি রেশিমবাগে রয়েছে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মৃতিমন্দির এবং দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সমাধিস্থল।

জানো কি?

ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধ্যেয়বাক্য

- গুপ্তচর সংস্থা 'র'— ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
- অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো— বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ।
- আইআইটি খড়্গপুর—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।
- আইআইটি কানপুর— তমসো মা জ্যোতির্গময় ।
- আইআইটি মুম্বই— জ্ঞানং পরমং ধ্যেয়ম্।
- আইআইটি রুরকী— শ্রমং বিনা ন কিমপি সাধ্যম্।

ভালো কথা

ঠাকুমার কাঠবিড়ালি

আমাদের বাড়িতে কোথা থেকে দুটো কাঠবিড়ালি এসে বারন্দার মিটারবক্সের উপর বাসা করেছে। আমার ঠাকুমার সঙ্গে ওদের খুব ভাব। ঠাকুমার হাত থেকে ওরা বিস্কুট খায়। ঠাকুমার গায়ে মাথায় ওঠে। সেদিন দুপুরে ঠাকুমা কুয়োর পাড়ে গিয়েই খুব চিৎকার করতে শুরু করল। আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখি দুটো কাঠবিড়ালীই জলের গামলা মধ্যে মরে ভেসে রয়েছে। ঠাকুমার সেকি কান্না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল মিটার বাক্সের ওপর ওদের দুটো ছানা রয়েছে। বাবা ছানা দুটোকে এনে ঠাকুমার হাতে দিল। ঠাকুমা তুলো বিছিয়ে লাল টুকটুকে ছানা দুটোকে রেখে তুলোর সলতে পাকিয়ে দুধে চুবিয়ে খাওয়াতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই ওদের গায়ে লোমে ভরে গেল। খিদে পেলেই চিঁ চিঁ করতে থাকে। ঠাকুমা তখনই সলতে পাকিয়ে দুধ খাওয়াতে থাকে। আমার সঙ্গেও ছানা দুটোর খুব ভাব হয়েছে।

প্রতিমা মহান্তি, নবম শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন্ধ্যা প্র প স	(১) কৌ ল স্থা শ ত্য প
(২) ই ভা চ তি	(২) ন্দু স্ব ব নি ভা ক

১৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) রক্ত কণিকা (২) রক্তকমল

১৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) ব্যভিচারপরায়ণ (২) চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়

উত্তরদাতার নাম

(১) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (২) সুজয় মহান্তি, মানবাজার, নামোপাড়া, পুরুলিয়া। (৩) অরিত্র মুখার্জী, সিমলাপাল, বাঁকুড়া। (৪) জীবন সরদার, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বর্ষপূর্তি পালনের উদ্যোগ আর এস এসের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি গোয়ালিয়রের কেদারধামে অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা। সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এবারের প্রতিনিধি সভায় মানবতার

বিকাশে ভারতীয় পরিবার প্রথার অবদান সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বর্ষপূর্তি পালনের কথা ঘোষণা করেছেন।

'ভারতীয় পরিবার প্রথা : মানবতার বিকাশে আশীর্বাদস্বরূপ' প্রস্তাবের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা বিশ্বাস করে ভারতীয় পরিবার প্রথার জীবনমুখী এবং মূল্যবোধভিত্তিক প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আন্তরিক প্রয়াস প্রয়োজন। দৈনন্দিন আচরণ ও ব্যবহার যেন পারিবারিক বন্ধনকে অটুট রাখতে পারে এবং সেই বন্ধন যেন চরিত্রগঠন, মূল্যবোধের নির্মাণ ও বিকাশ এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তোলার সহায়ক হয়। পারিবারিক জীবন হবে সুখের এবং শান্তির। সেই সুখশান্তি পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে খাওয়া, পুজোপাঠ, উৎসব পালন এবং তীর্থযাত্রার সময় অনুভব করা যায়। মাতৃভাষায় কথা বলা, স্বদেশিয়ানা এবং পারিবারিক ও সামাজিক পরম্পরার অনুসরণ পরিবার প্রথাকে শক্তিশালী করে। পরিবার ও সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বাড়ানোর জন্য সামাজিক ধর্মীয় ও শিক্ষাগত কারণে দান এবং সামর্থ্য অনুযায়ী গরিব মানুষকে সাহায্য করা প্রতিটি পরিবারের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সময় যত এগিয়েছে পণ দেওয়া-নেওয়া, অস্পৃশ্যতা, জাতপাত এবং আরও নানা কুসংস্কারের কারণে সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা সমাজের প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানাতে চায়, আসুন, আমরা আগে আমাদের পরিবার থেকে এইসব কুপ্রথা উচ্ছেদ করি। আমাদের এই প্রয়াস সমাজকে আবার মূল্যবোধে ঋদ্ধ এবং সকলের প্রতি সমানধর্মী হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।'

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, 'পরিস্থিতির চাপে যারা একক পরিবারে থাকতে বাধ্য হন তাদের উচিত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সময় কাটানো। পৈতৃক ভিটেমাটির সঙ্গে জুড়ে থাকার অর্থ শেকড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকা। সেইজন্য মাঝে মাঝে একসঙ্গে থাকা এবং পরিবারের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের মৌলিক শিক্ষা হওয়া উচিত স্থানীয় রীতিনীতি অনুযায়ী, যাতে তারা ছোটোবেলা থেকে পারিবারিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বৃহত্তর পারিবারিক বোধে সম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্য যৌথ পরিবারের সবাইকে নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা জরুরি। এক্ষেত্রে বালগোকুলম্ এবং সংস্কার বর্গের মতো অনুষ্ঠান উপযোগী হয়ে উঠতে পারে।'

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বর্ষপূর্তি প্রসঙ্গে দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেন, 'আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বর্ষপূর্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ সরকার, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং হাজার হাজার আজাদ হিন্দ সেনার অবদান স্মরণ করতে চাই। আজাদ হিন্দ সরকারের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা এক কথায় সাধুবাদযোগ্য। আমরা সবার কাছে আবেদন জানাই, স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ইতিহাস দেশের যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস স্বরূপ। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে এবং অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে এ ব্যাপারে তাদের সচেতন করে তুলুন।'

বহুসংখ্যক রোহিঙ্গাকে নির্জন দ্বীপে পাঠাতে চাইছে ঢাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রোহিঙ্গাদের বিপদ এবার কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছে বাংলাদেশ। সামনের এপ্রিলে অন্তত ২৩ হাজার রোহিঙ্গাকে ভাসান চরে পুনর্বাসন দিতে চাইছে বাংলাদেশ প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প উপচে পড়েছে, প্রায় ৭ লক্ষ ৩০ হাজার লোক এখন সেখানে। ফলে বাড়তি লোককে এখানে ঠাঁই দিতে না পারায় পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিতে হচ্ছে। যদিও অভ্যন্তরীণ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, রোহিঙ্গাদের ব্যাপক ও অস্বাভাবিক হারে বংশবৃদ্ধি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে অপরাধপ্রবণতা ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ সরকার। তাই ক্যাম্পে লোকবসতি বেড়ে যাওয়ার নাম করে রোহিঙ্গাদের অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় পাঠাতে চাইছে তারা।

যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তে বেজায় চটেছে। তাদের যুক্তি নির্জন দ্বীপে রোহিঙ্গাদের পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশের প্রশাসনিক সূত্রের বক্তব্য, ২০১৭-র আগস্ট থেকে এখনও পর্যন্ত রাখাইন প্রদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুতেই কেবল কক্সবাজার শিবির ভরে যায়নি। রোহিঙ্গারা এরই মধ্যে প্রবল হারে বংশবিস্তার করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই বাড়তি জনসংখ্যার চাপ নিতে বাংলাদেশ সরকারের নাভিশ্বাস উঠছে। তাই নির্জন দ্বীপেই এদের পুনর্বাসন দিতে চাইছে সরকার। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনমনের বিষয়টিও তাদের মাথায় রয়েছে।

ভারত-সহ যে যে দেশেই রোহিঙ্গারা মায়ানমার থেকে উৎখাত হওয়ার পর গিয়েছে, সেখানেই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভারত সরকার রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাদের অর্থ সাহায্য ইত্যাদি করলেও বাড়তি দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। ভোটলোলুপ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এদেশে রোহিঙ্গাদের জামাই আদরে বরণ করার পক্ষপাতী হলেও তা যে দেশের পক্ষে রীতিমতো বিপদের কারণ হতো, বাংলাদেশের কক্সবাজার রোহিঙ্গা শিবিরই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন। আন্তর্জাতিক মুসলমান ভ্রাতৃত্বের চাপের কাছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংগঠনের নতিস্বীকারেও মুখ খুলতে চাইছে না ঢাকা।

মার্কিন গোয়েন্দা বাহিনীর ব্যর্থতা

আমেরিকার সেনা ঘাঁটির নাকের ডগায় তালিবান প্রতিষ্ঠাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ যেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। ডাচ সাংবাদিক বেট্টি ড্যাম তাঁর 'সার্চিং ফর অ্যান এনিমি' বইতে দাবি করেছেন তালিবান জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমর বহু বর্ষব্যাপী আফগানিস্তানের কাবুলে বৃহৎ মার্কিন সেনা-ঘাঁটির তিন কিলোমিটার দূরত্বে বাস করত। বলা বাহুল্য, ড্যামের গবেষণা লব্ধ বইটিতে এই তথ্য সামনে আসতেই আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৩ সালে মোল্লা ওমরের মৃত্যু হয়। ২০০১ সালের ৯/১১-তে পেন্টাগনে হামলার পরেই ওমরের মাথার দাম ১৩ মিলিয়ন ডলার ধার্য করে আমেরিকা। ড্যামের বিবরণ অনুযায়ী এরপরেই স্থানীয় রাজধানী কোয়ালাতে আত্মগোপন করে ওমর। এবং মার্কিন সেনার ভয়ে তার পালানোর খবরও সঠিক ছিল না।

ওমরের দেহরক্ষী জব্বর ওমারির সঙ্গে সাক্ষাতের ভিত্তিতে এধরনের নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছেন সাংবাদিক ড্যাম। প্রায় পাঁচ বছর এনিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। স্বভাবতই মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে গিয়েছে। ওমর তাদের নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও তার টিকিটিও তারা ছুঁতে পারল না কার গাফিলতিতে, প্রশ্ন সে নিয়েও। বিশেষ করে মার্কিন সেনাবাহিনী ওমরের পরিবারের ওপর নজরদারি চালাল না কেন, রহস্য তা নিয়েও।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ মামলায় নতুন করে সাক্ষী হতে চাইলেন পাকিস্তানি মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ২০০৭ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতকারী সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলায় ন্যাশনাল ইনভেসটিগেটিভ এজেন্সির পাঁচকুলার বিশেষ আদালতের রায় দেওয়ার কথা ছিল ১১ মার্চ। আদালতের রায় দেওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে জনৈক পাকিস্তানি মহিলা এই মামলায় তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণের আবেদন জানান। ওই মহিলার আর্জি গ্রহণ করার পর আদালত এনআইএ অধিকর্তা সহ সংশ্লিষ্ট মামলায় দক্ষিণপন্থী ক্রিয়াকলাপে জড়িত বলে অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ, লোকেশ শর্মা, কমল চৌহান ও রাজেন্দ্র চৌধুরীকে আগামী ১৪ মার্চ বিশেষ আদালতে হাজির থাকার নতুন নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত ওই দিনের বিস্ফোরণে

নিহত পাকিস্তানি মহম্মদ ভকিলের কন্যা রহিলা ভকিলের উকিল মোমিন মালিক তাঁর মক্কেলের (রহিলার) জবানবন্দি গ্রহণের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেন।

এন আই এ বিচারক জগদীপ সিংহ গত ৬ মার্চ এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি সমাপ্ত হওয়ার পর ১১ মার্চ রায় দানের দিন ধার্য করেছিলেন। শ্রীমতী ভকিলের এই অতি বিলম্বিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি আগামী ১৪ মার্চ আবার নতুন করে আবেদনকারীর জবানবন্দি নেবেন। রহিলার উকিল আদালতকে জানান তাঁর মক্কেলের বয়ান অনুযায়ী এনআইএ যে ১৩ জন পাকিস্থানি সাক্ষীকে মামলায় হাজির হওয়ার সমন পাঠিয়েছিলেন পাকিস্তান সরকার তাদের এক জনকেও সে খবর দেয়নি। এই মোমিন মালিকই ইতিপূর্বে ভারতীয় রেলওয়ে ক্লেম ট্রাইব্যুনালে রাহিলার ক্ষতিপূরণের মামলা লড়ছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে দীর্ঘ ১২ বছর কেটে যাওয়ার পর ঠিক রায় দানের সময়ে রাহিলা তাঁর আইনজীবী মারফত আরও কিছু পাকিস্তানির এই মামলায় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়টির মধ্যে নতুন কোনো চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন ওয়াকিবহাল মহল।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সম্পর্কে দেশকে মিথ্যে তথ্য কংগ্রেস সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর কুখ্যাত বিমান ছিনতাই পর্বে জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারকে সঙ্গী করে অজিত দোভাল কান্দহার গিয়েছিলেন বলে রাহুল গান্ধী সম্প্রতি জানিয়েছেন। উল্লেখিত সময়ে শ্রী দোভাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অ্যাডিশানাল ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গোয়েন্দা দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী আই সি ৮১৪ নং বিমানে জঙ্গিদের মুক্তিপণ হিসেবে বন্দি ১৬১ জন ভারতীয়ের বিনিময়ে ভারতের জেলে বন্দি পাকিস্তানি জঙ্গিদের

অজিত ডোভাল

ছেড়ে দেওয়ার আপোশ মীমাংসা করতে সেদিন দোভাল মাসুদের সঙ্গে একই বিমানে যাননি। তিনি এর অনেক আগে থেকেই কান্দাহারে অন্য জঙ্গিদের সঙ্গে সালিশি আলোচনায় রত ছিলেন বলে দপ্তরের বক্তব্য। এই সূত্রে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য যে সর্বৈব মিথ্যে দপ্তর কর্তারা তা দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, জঙ্গিরা প্লেন আটক করার পর প্রথমে ভারতের জেলে বন্দি ৩৬ জন সন্ত্রাসবাদীর মুক্তি দাবি করে, একই সঙ্গে তারা ২০০ মিলিয়ন ডলারের বিশাল মুক্তিপণও চায়। তৎকালীন বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার বৈঠকে নিরাপরাধ ১৬১ জন ভারতীয়ের প্রাণের বিনিময়ে জঙ্গি মাসুদ আজহার আরও দু'জনকে মুক্তি দেওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গি যাদের মধ্যে তালিবানের সন্ত্রাসবাদীরাও ছিল তাদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে শ্রী দোভাল সঙ্গে সঙ্গেই কান্দাহার উড়ে যান। এই ঘটনার সমর্থন মিলেছে তৎকালীন গৃহমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণী লিখিত 'My Country my life' গ্রন্থে। সেই সময়কালীন RAW-এর প্রধান এ এস ডুলাটের লেখা 'Kashmir the vajpayee years' নামের প্রামাণ্য গ্রন্থটিতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। ভারতের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিংহ মাসুদ আজহার, ওমর শেখ ও মুস্তাক জারগার নামে মোট তিন জঙ্গিকে নিয়ে উল্লেখিত প্লেনে কান্দাহার যান। জঙ্গি ওমর শেখ পরবর্তীকালে মার্কিন সাংবাদিক ড্যানিয়েল গার্লকে খুন করে বলে দপ্তর সূত্রে প্রকাশ। শুধু তাই নয়, দপ্তর সূত্র অনুযায়ী দোভাল ও তাঁর সহকারী মধ্যস্থতাকারীরা অত্যন্ত সফলভাবে জঙ্গিদের দাবিকে অনেকটাই নামিয়ে আনেন ও দিল্লিকে জানান। এই আলোচনা ছিল তাঁর কাজেরই অংশ। এমন ইচ্ছাপ্রণোদিত এমন একটি সংবেদনশীল বিষয়ে এতদিন পরে রাহুল গান্ধীর মিথ্যে বালখিল্য মন্তব্য নিতান্তই অনভিপ্রেত।

মুখার্জিদার বউ
উত্তরণের ছবি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নারীর অধিকার, নারী দিবস, মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে নিয়মিত চর্চা, অনুষ্ঠান চললেও সংসারে ফলিত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তফাতটা যে তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এখনও অতলান্ত, তা মুখার্জিদার বউ ছবিতে খুঁচিয়ে তুললেন পৃথা চক্রবর্তী।

মুখার্জীদা, ঘোষ দা, পোড়েলদার বউদের সর্বদাই এই নিজের নাম হারানোর টানাপোড়েনই ছবির প্রাণকেন্দ্র।

শাশুড়ি-বউমা আজ যতই আধুনিক হন না কেন, সংসারে নিজের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা অংশীদারত্বে চলে যাওয়ার শূন্যতায় অনেকেই আক্রান্ত হন। এর ওপর স্বামী বিয়োগের বাড়তি অভাববোধ ঘিরে ধরলে অনেক ক্ষেত্রেই পুত্রবধূর সঙ্গে দৈনিক সম্পর্কে যে তিক্ততার কামড় আসে তা চলচ্চিত্রীয় নান্দনিকতায় ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন পৃথা। ছবিটির কাহিনি বিন্যাসের সঙ্গে জড়িত আছেন বেলাশেষে, রামধনু, হামি প্রভৃতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ছবির পরিচালক শ্রীমতী নন্দিতা রায়। প্রাত্যহিক জীবনে মানবিক সম্পর্কের তীক্ষ্ণ ব্যবচ্ছেদ করতে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, পৃথা তারই পথে চললেন।

ছোটো সংসারটির কর্ত্রী শোভা (অনসূয়া মজুমদার), বউমা (কণিনীকা), শাশ্বত (বিশ্বনাথ বসু), প্রতিবেশী পুতুল (অপরাজিতা) ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক মনোবিদের চরিত্রে রয়েছেন দক্ষ অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা। ছবিতে শাশ্বত ছাপোষা চাকরি করে, স্ত্রী অদিতি গৃহবধূ। অদিতি কিন্তু এখনকার মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মতো যথেষ্ট লেখাপড়া জানে। কিন্তু সে চেষ্টা ও ইচ্ছে দু'টো সত্ত্বেও চাকরি পায়নি। এ নিয়ে তার যে অন্তর্বেদনা তা মাঝে মাঝেই ছবিতে ফুটে উঠেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর শোভা বউমার মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে পেলেও ছবিটি কখনই সান্ধ্যকালীন সিরিয়ালের তুমুল কলহ ও চক্রান্তের কাহিনি হয়ে ওঠেনি।

শাশুড়ি কিন্তু নাতনিকে ভালোবাসেন, তার 'পাওয়ার স্ট্রাগল' শুধু বউমার সঙ্গে। তার ইচ্ছে বউমা যেন বারমুখী না হয়। সংসারের বাঁধন শিথিল হয়ে যেতে পারে। কিছু পারস্পরিক সম্পর্কের লক্ষ্মণরেখা যখন অতিক্রান্ত অদিতি তখন ফিজিওথেরাপিস্টের নাম করে শাশুড়িকে মনোবিদের কাছে নিয়ে যায়। অতি মন্থরভাবে সূক্ষ্ম মানসিক জোয়ার ভাঁটার টানে ছবিটি শাশুড়ি বউমার চিরকালীন দ্বন্দ্বমূলক অবস্থান থেকে সরে যেতে থাকে। মনোবিদ ঋতুপর্ণা চমৎকার পেশাগত পারদর্শিতায় দু'জনেরই মনের অন্তর্লীনে পাওয়া না পাওয়ার অলি-গলিতে সন্ধানী দৃষ্টি দেন। পথ সন্ধানও দেন। ছেলে এবং স্বামী শাশ্বতকে বিষয়টা গোপন রাখলেও জানার পরে সে স্ত্রীকে তার রোজগারে বেঁচে থাকার বস্তাপচা কথা আউড়ে চরম অপমান করে। মজার কথা, শাশুড়ি বউমার সম্পর্ক তখন আর ভিন্নখাতে প্রবহমান নয়। তাঁরা নিজস্ব অতৃপ্ততা বা ইচ্ছাপূরণের এক নতুন সন্ধান পাচ্ছেন। শাশুড়ি-বউমা যৌবনের প্রেম উন্মেষের ইঙ্গিতের কথা সম্পর্কের স্বাভাবিকত্বে উত্তরণের ফলে পরস্পরকে অকপটে জানাচ্ছেন। তাঁরা যেন একে অপরের পরিপূরক। একটা ইংরেজি কথা, খুব দাপটে কোনো পুরুষের গুণ বোঝাতে বলা হয় 'He is at his un compromising best' অর্থাৎ তিনি খুবই আপোশহীন, একবগ্গা, মহান ব্যক্তি। কখনও আপোশ করেন না। ভারতীয় সংসার যাত্রায় এই আপোশ শুধু মেয়েরা করবে। মনোবিদ বলছেন যে মেয়েটি ২৬ বছর যাকে বাবা মা বলেছে হঠাৎ সেই ডাকটা অন্য কাউকে সে যখন ডাকছে তখন তার জন্য সমবেদনা সঞ্চিত রাখুন। ছবিতে অন্য চমক আছে। শেষ দৃশ্যে শাশুড়ি বউমা মুখার্জিদাকে ছেঁটে ফেলে শুধু নিজেদের নামটুকু বলছে ছবিটি ভালো লাগবে। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

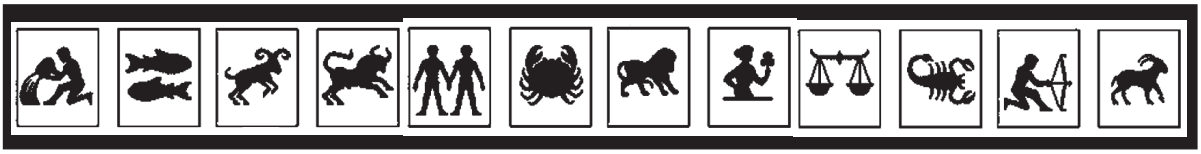

১৮ মার্চ (সোমবার) থেকে ২৪ মার্চ (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে মঙ্গল, কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে শুক্র কেতু, কুম্ভে বক্রী বুধ, মীনে রবি। পুনরায় শুক্রবার বিকাল ৬-১৪ মিনিটে মঙ্গলের বৃষে প্রবেশ। ওইদিন রাত্রি ১-৩০ মিনিটে শুক্রের কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কর্কটে অশ্লেষা নক্ষত্র থেকে তুলায় বিশাখা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ বিদ্যা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় প্রতিপত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তবে আত্মীয় বান্ধব, মাতার স্বাস্থ্য, কৃষি বিষয়ে বিশেষ যত্ন এবং সতর্কতা আবশ্যক। নিকট ভ্রমণ, দালালি, প্রমোটিং ও আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় অনুকূল সময়। উচ্চস্থান হতে পতন ও কোমর/উরুর চোট-আঘাতের যোগ। সন্তানের মানসিক চঞ্চলতা ও পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির যোগ।

বৃষ ঃ ভ্রাতা ও প্রতিবেশীর সখ্য, লাইফ পার্টনারের শরীর বিষয়ে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। একাধিক পন্থায় অর্থ আয়ের যোগ তবে ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুঁকিবহুল। ব্যয়বাহুল্যের চাপ হেতু বাঁকাপথে রোজগারের চিন্তা পরিহার করুন। কর্মক্ষেত্রে অধস্তনের মন্দ ব্যবহার ও পিতার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উদ্বেগ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা অতিক্রম করবেন।

মিথুন ঃ কর্মে উন্নতি ও ঋণমুক্তি। শিশুর সারল্যে কথাবার্তা ও লিখিত চুক্তিতে প্রতারিত হতে পারেন। কবি, লেখক, হিসাবরক্ষক, প্রযুক্তিবিদ, গণিতজ্ঞ ও গবেষকের কর্ম দক্ষতার বহুমুখী প্রকাশ। যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীর রোগ নির্ণয়ে বিলম্ব। যুবক মিত্র হিতকারী নহে। প্রেমজ ব্যাপারে মানসিক অস্থিরতা।

কর্কট ঃ আইনি জটিলতা ও কর্মে সতর্কতার প্রয়োজন। বাসগৃহ অথবা জমি ক্রয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। সপ্তাহের প্রান্তভাগে পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি, সমাজ কল্যাণে সুহৃদ সান্নিধ্যে প্রশান্তি ও জনপ্রিয়তা লাভ। কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভ ও উচ্চ শিক্ষার্থীদের প্রবাস ও মেধার বিকাশ। দাম্পত্য সম্পর্ক সুখকর নয়।

সিংহ ঃ সন্তান-সন্ততির পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। কর্মজনিত যশ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি চপলতা-ক্রোধ পরিহার অন্যথায় ভ্রাতার কষ্ট, গৃহ পরিবর্তন। অভিনেতা, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর্য শিল্পী, সাহিত্যিকের স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও নিপুণতায় বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রম। গুরুজনের পরামর্শ ব্যবসা ও বকেয়া পাওনার সহায়ক।

কন্যা ঃ কর্মক্ষেত্রে ভালো কাজে শংসার পরিবর্তে বদনাম হতে পারে। স্ত্রীর দূরদর্শিতায় বৈষয়িক উন্নতি ও পারিবারিক সমৃদ্ধি। সহদর ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতি, বিরোধীদের বশ্যতা স্বীকার ও ফাটকায় প্রাপ্তি। স্ত্রী জাতিকাদের গর্ভপাত ও প্রবাসীর প্রত্যাবর্তন। টাইফয়েড জ্বর ও মূত্রাশয়ের চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

তুলা ঃ সাত্ত্বিক, গুণীজন, বুদ্ধিজীবীর সান্নিধ্যে সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের সুচনা। পরিশ্রম আর্থিক উন্নতির মাপকাঠি। স্বীয় প্রতিভায় প্রতিষ্ঠানগত সম্মান তবে আয়ের শ্লথগতি। গবেষণা, বিদ্যার্থী ও সাহিত্য পিপাসুদের জ্ঞানের প্রসার ও সাধনায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ। কর্মক্ষেত্রে সমালোচনা, বিড়াম্বনা, কর্ম পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক ঃ দৃঢ়তা, কর্তব্যপরায়ণতা, উদারতা, মেধা, উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে গ্রীষ্মের তাপদাহের অবসানে নতুন করে জীবন পথে বসন্তের নব-পত্রোদ্গম। পেশাদাররা উচ্চপদে উন্নীত, উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বিদেশ গমন ও কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের সম্ভাবনা। সপ্তাহের শেষভাগে বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ, মিষ্ট স্বভাবের প্রকাশ ও সময়ের অপচয়।

ধনু ঃ জমি, বাড়ি বিলাসসামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে সপ্তাহটি প্রতিকূল। সর্বপ্রকার কলাকুশলীদের কাজের প্রসার তবে আর্থিক সাফল্য আশাব্যঞ্জক নয়। কল্পনা প্রবণতা ও অধিক আত্মবিশ্বাস চলার পথে বিঘ্নস্বরূপ। ব্যয়াধিক্য ও হঠাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি যোগ।

মকর ঃ পুলিশ, আর্মি, বিএসএফ ও ক্রীড়াবিদের ব্যস্ততা ও দক্ষতা বৃদ্ধি। কৃষি, লেদমেশিন, ছাপাখানা, চর্মজাত ব্যবসায় প্রতিযোগিতা এবং সাফল্য। স্পষ্টবাদিতা ও আদর্শ কেন্দ্রিক জনপ্রিয়তা। বাকসংযম, দোদুল্যমানতা পরিহার ও মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। ভ্রাতা-ভগ্নী ও সন্তানের কর্মসংস্থানের সুখবর আনন্দবর্ধক।

কুম্ভ ঃ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভবী শক্তিতে কর্মে জটিলতার অবসান ও কর্তৃপক্ষের শংসা প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীর জ্ঞানের উন্মেষ, সন্তানের কর্মজীবনে প্রবেশ, আর্থিক প্রাবল্য ও প্রেম থেকে পত্নীর রূপের প্রকাশ। জামি, বাড়ি, গাড়ি ক্রয়ের শুভ সময়। ওষুধ, মাদক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত পেতে পারেন।

মীন ঃ দুরূহ কাজে কঠিন পরিশ্রমে প্রশংসা ও সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে যোগদানে মানসিক প্রশান্তি। নীতিগত ব্যাপারে আপোশহীনতা সমালোচনায় পর্যবসিত হবে। স্বজনের আর্থিক সংকটে সহযোগিতায় অসমর্থ হওয়ায় আত্মগ্লানি। কর্মস্থলে গতানুগতিকতায় মানসিক অবসাদ। সপ্তাহ শেষে জীবন-জীবিকায় আকস্মিক ইতিবাচক পরিবর্তন।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য